প্রশ্নোত্তরে

ভারতীয় জনতা পার্টি

কি ও কেন?

সপ্তম (পরিবর্ধিত) সংস্করণ ২০১৯

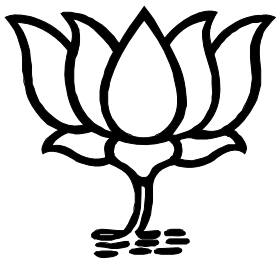

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ
৬, মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

রাজনীতিতে কোনো কিছুই স্থির থাকে না, এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজনও অনুভূত হয়। মমতা ব্যানার্জীর সাত বছরের কুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এই প্রয়োজন অনুভব করেছি। তাই এই নতুন সংস্করণ।

ইতিমধ্যে, যিনি আমাদের দলের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন সেই তথাগতদা, (তথাগত) রায় আজ রাজনীতির বৃত্তের বাইরে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে সাংবিধানিক পদে কর্মরত। তাই এই দায়িত্ব আজ আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। আশা করি তাঁর পরম্পরা আমরা বজায় রাখতে পেরেছি।

কলকাতা

বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী
সহ-সভাপতি

ষষ্ঠ (পরিবর্ধিত) সংস্করণের ভূমিকা

তৃণমূল সরকার মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসার পরে, এবং সাত বছর ধরে নানা কুকীর্তি ও কুশাসনের পরিচয় দেবার পরে, এই পুস্তিকাটির কিছু পরিবর্ধনের প্রয়োজন ছিল—তাই-ই করা হয়েছে। সঙ্গে সামান্য কিছু পরিবর্তনও। পুস্তিকাটি পার্টি কর্মী ও জনসাধারণের কাছে যে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা

প্রতাপ ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩ আগস্ট, ২০০৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৭ অক্টোবর, ২০০৫
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০১০
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ২০১৪
পঞ্চম (পরিবর্ধিত) সংস্করণ ঃ ২০১৪
ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ ২০১৮
সপ্তম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে
প্রতাপ ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

মুদ্রক ঃ
নিউ ভারতী প্রেস
২০৬, বিধান সরণি,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রশ্ন ১। বিজেপি, ভাজপা বা ভারতীয় জনতা পার্টি কী?

উত্তর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (সংক্ষেপে বিজেপি) একটি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। এটি কোনো জাতভিত্তিক, প্রাদেশিক বা ধর্মীয় সংগঠন নয়, এর দরজা জাতি ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের জন্য উন্মুক্ত—প্রয়োজন একমাত্র আমাদের দর্শন ও নীতিতে বিশ্বাস। এটি একটি কর্মী নির্ভর বা ক্যাডার-বেস্‌ড্ পার্টি, যাতে পূর্ণকালীন এবং আংশিককালীন দুই ধরনের কর্মী ও কার্যকর্তাই আছেন। এই পার্টির একটি লিখিত, স্পষ্ট গঠনতন্ত্র আছে, পার্টির সমস্ত কাজ সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দলের দর্শনের নাম একাত্ম মানববাদ, যার প্রণেতা পার্টির অন্যতম প্রাণপুরুষ স্বর্গত দীনদয়াল উপাধ্যায়। যে কোনো রাজনৈতিক দলের মতই এই দলের উদ্দেশ্য নিজেদের আদর্শের প্রচার, সাধারণ মানুষকে দলের আদর্শে ও নীতিতে বিশ্বাসী করা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে নিজেদের আদর্শকে রূপায়িত করা।

প্রশ্ন ২। বিজেপি কে আমরা 'এ পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স', বা 'একটু অন্য ধরনের পার্টি' বলি কেন?

উত্তর ঃ স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে আমরা যত রাজনৈতিক দল দেখেছি তাদের প্রায় সবাই এক ভণ্ড 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা বলে। এই তথ্যকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'—যা আদতে এক নির্লজ্জ সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছু নয়—দেশের সর্বনাশ করেছে। এ সম্বন্ধে ১৫ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। দেশে দু'ধরনের রাজনৈতিক দল আছে। এর মধ্যে বিজেপি ও বামপন্থী দলগুলি ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে কোন আদর্শের উপর চলে। অন্যদের মধ্যে আছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি। অন্যান্য এই দলগুলি সাধারণত হয় কোনো একজন নেতা-নেত্রীর, না হলে পরিবারের কথায় চলে। বামপন্থী দলগুলি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের কথায় চলে না বটে, কিন্তু দেশের বাইরে থেকে আনা—ক্ষেত্রবিশেষে দেশবিরোধী—তত্ত্বে বিশ্বাস করে। অপরপক্ষে বিজেপি এইসব দোষমুক্ত। বিজেপি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের দল নয়, বিজেপি-র দেশভক্তিতে শত্রুদেরও তিলমাত্র সন্দেহ নেই। ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতায় বিজেপি বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে 'সর্বধর্মসমভাব'— যার অর্থ সব ধর্মের প্রতি সমান ব্যবহার, তাতে এবং হিন্দুত্ব', যার অর্থ 'ভারতীয়ত্ব'—তাতে (এই কথাগুলি ১৫-১৬ নং প্রশ্নোত্তরে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। বিজেপি কোনো বিদেশ থেকে আমদানি করা দেশবিরোধী বাতিল মতাদর্শের ওপরেও চলে না। সেইজন্যই বিজেপি এইসব দল থেকে আলাদা এবং বিজেপি কে বলা হয় 'পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স'—একটু অন্য ধরনের পার্টি।

প্রশ্ন ৩। বিজেপি-র জন্ম কী করে হল?

উত্তর ঃ বিজেপি-র জন্মের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (সংক্ষেপে সঙ্ঘ) সম্বন্ধে জানতে হবে। সঙঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ছিলেন নাগপুরের মারাঠীভাষী মানুষ, ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার

সূচিপত্র

বিষয়

১। বিজেপি, ভাজপা বা ভারতীয় জনতা পার্টি কী?
২। বিজেপি কে আমরা 'এ পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স' বা 'একটু অন্য ধরনের পার্টি' বলি কেন?
৩। বিজেপি-র জন্ম কী করে হল?
৪। শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।
৫। বিজেপি অফিসে শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া আর কার কার ছবি রাখা হয়?
৬। বিজেপি-র পার্টি সঙ্গীত কী?
৭। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।
৮। দীনদয়ালজী প্রণীত বিজেপি-র দর্শন 'একাত্ম মানববাদ' বিষয়ে কিছু জানতে চাই।
৯। বিজেপি-র 'পঞ্চনিষ্ঠা' বা পঞ্চ প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।
১০। বিজেপি-বিরোধীদের রটনা কি সত্যি?
১১। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা ছিল?
১২। ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা কি শুধু কংগ্রেসই ছিনিয়ে এনেছে?
১৩। সিপিএম আমাদের গান্ধী হত্যার জন্য দায়ী করে। এটা কি ঠিক?
১৪। মিথ্যা জেনেও আমাদের উপর এমন অভিযোগ করে কেন?
১৫। বিরোধীরা সর্বদাই বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক বলে থাকে। এর সত্যতা কতটা?
১৬। বিজেপির 'হিন্দুত্ব' ব্যাপারটা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়?
১৭। মুসলমানদের সম্বন্ধে বিজেপি-র ভাবনাচিন্তা কী?
১৮। মুক্ত বা বাজার অর্থনীতি বনাম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।
১৯। বিজেপি পুরোপুরিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একটি পার্টি? এমন পার্টি কি করে গরীব লোকের স্বার্থ রক্ষা করবে?
২০। লাভজনক সংস্থা কেন বিক্রি করা হচ্ছে?
২১। এই রাজ্যে এই পার্টির ভবিষ্যৎ কী?
২২। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পেলে বিজেপি কি করবে?
২৩। পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সম্বন্ধে ও সে ব্যাপারে বিজেপির চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই
২৪। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে মমতা যে আন্দোলন করেছিলেন সে সম্বন্ধে বিজেপির মনোভাব কি?
২৫। তৃণমূল ও সিপিএম রটায় বিজেপি 'মাড়োয়ারিদের পার্টি, হিন্দীভাষীদের পার্টি।' এটা কি ঠিক?
২৬। মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ চালাচ্ছে (বা চালাবার চেষ্টা করছে) সে বিষয়ে বিজেপির মতামত কি?
২৭। মমতা ব্যানার্জীর গত সাত বছরের (২০১১ সাল থেকে) রাজত্ব কাল সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলুন।

চক্রান্তে সে-মন্ত্রিসভা বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু তার মধ্যেই হক সাহেবের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছিলেন এক অসাধারণ, অসাম্প্রদায়িক ন্যায় বিচারের। তারপর পঞ্চাশের মন্বন্তর, কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির হিন্দুহত্যা (দাঙ্গা নয়, একতরফা হিন্দুহত্যা ও নারীধর্ষণ), স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দুদের পাকিস্তান ত্যাগ—প্রতিটি বিষয়ের শ্যামাপ্রসাদ স্বাক্ষর রেখে গেছেন অতুলনীয় রাজনৈতিক সাহস ও দূরদৃষ্টির। স্বাধীনতার পর তিনি হিন্দু মহাসভা ছেড়ে দিয়েছেন। এরপরই তাঁর সঙ্গে গোলওয়ালকরজীর দেখা হল—যেন প্রয়াগ সঙ্গমে এসে গঙ্গা-যমুনার মিলন হল। নতুন দল তৈরি করার জন্য গোলওয়ালকরজী শ্যামাপ্রসাদকে দিলেন তাঁর নিজের হাতে তৈরি, বাছাই করা কিছু স্বয়ংসেবক—যাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুন্দরসিং ভাণ্ডারী, জগদীশ মাথুর, অটলবিহারী বাজপেয়ী। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে যে দলের প্রতিষ্ঠা হল তার নাম হল ভারতীয় জনসঙ্ঘ, নির্বাচনের প্রতীক 'প্রদীপ' (হিন্দিতে দীপক)।

জনসঙ্ঘ বাড়তে লাগল। দল আরম্ভ হয়েছিল স্বয়ংসেবকদের নিয়ে, কিন্তু কালক্রমে সঙ্ঘের বাইরের বহু মানুষ এসে পার্টিতে যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমানও ছিলেন। ইতিমধ্যে বন্দী অবস্থায় অতিশয় সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হল। তাতে পশ্চিমবাংলার পার্টি খুব ঘা খেল, কিন্তু বাকি ভারতে জনসঙ্ঘের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। এরপরে অপঘাত মৃত্যু হল পার্টির অন্যতম প্রাণপুরুষ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের, যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। তারপর ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনী মামলায় হেরে গিয়ে জরুরী অবস্থা জারী করলেন, আর জয়প্রকাশ নারায়ণ আহ্বান দিলেন সমস্ত কংগ্রেস-বিরোধী অ-কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে এক হয়ে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনসঙ্ঘ স্বেচ্ছায় নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে জয়প্রকাশ গঠিত 'জনতা পার্টিতে যোগ দিল। সঙ্গে যোগ দিল প্রজা সোশালিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস (সংগঠন), স্বতন্ত্র পার্টি এবং আরও অনেকে।

এরপর জনতা পার্টি ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিতল এবং মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলেন। বিদেশমন্ত্রী হলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। কিন্তু এত সুখ বেশিদিন সইল না। কংগ্রেসের দেওয়া টোপ গিলে ফেলে চরণসিং পার্টি ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এলেন, তারপর কংগ্রেস তার পেছন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। জনতাপার্টির রাজের পতন হল, বিপুল সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস আবার ফিরে এল।

ইতিমধ্যে জনতা পার্টির ভিতরের কিছু নেতার চুলকানি হতে লাগল। চুলকানির কারণ, পার্টির ভিতরে প্রাক্তন জনসঙ্ঘীরা এখনও একতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং খুবই সম্ভাবনা আছে তারা বাকি সবাইকে হটিয়ে দিয়ে পার্টিটাকেই দখল করে নেবে। এখন কী করা? ওঁরা একটা ঘোষণা করে দিলেন যে জনতাপার্টির কেউ আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এর উত্তরে পুরনো জনসঙ্ঘী নেতাদের নেতা ও মুখপাত্র অটলবিহারী

সঙ্গে পরিচিত হন। এটা ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকের কথা। চিন্তা ভাবনা করে হেডগেওয়ারজীর এই ধারণা হয় যে ভারত একদিন স্বাধীন হবেই, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে হিন্দুদের যদি উত্থান না হয় তবে বিপদ। হিন্দুসমাজ যদি জাতি-সম্প্রদায়-ভাষার বিভেদ ভুলে এক হতে না শেখে, যদি 'আমি ব্রাহ্মণ—তুমি শূদ্র', 'আমি বাঙালি—তুমি বিহারী' এই সব কথা ভুলে গিয়ে 'আমিও হিন্দু—তুমিও হিন্দু' এই কথা বলতে না শেখে, তবে স্বাধীনতা পেয়েও কোনো লাভ হবে না, উপরন্তু ক্ষতি হবে। এই কথা ভেবে হেডগেওয়ারজী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, যা কালক্রমে পৃথিবীর বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ডাঃ হেডগেওয়ার ১৯৪০ সালে দেহত্যাগ করবার পরে সঙ্ঘের দায়িত্বে আসেন মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর, যাঁকে স্বয়ংসেবকরা সবাই 'পরম পূজনীয় গুরুজি' বলেই জানেন। ইনি বেনারস হিদু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারীও ছিলেন। এর মধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সঙ্গে এল স্বাধীনতা, আর তারপরেই গান্ধীজি নিহত হলেন নাথুরাম গোডসে-র হাতে। নাথুরাম বহুকাল আগে সঙ্ঘে যেতেন (তিনি কংগ্রেসেও যেতেন) এই অপবাদ দিয়ে সঙ্ঘের উপর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল সরকার। এই নিষেধাজ্ঞা যে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে হয়েছিল তার প্রমাণ, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হল সেই সরকারই।

এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটা গোলওয়ালকরজীকে ভাবিয়েছিল। তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের স্বচ্ছ ভবিষ্যৎদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যারা হিন্দুসমাজকে বিভক্ত ও দুর্বল করে রাখতে চায় তারা সঙ্ঘের উপর আরও রাজনৈতিক আঘাত হানবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে সঙ্ঘের আদর্শ নিয়ে কয়েকজন স্বয়ংসেবকের রাজনীতিতে আসা দরকার। এদিকে সঙ্ঘ নিজে কখনো রাজনীতিতে জড়াবে না। এই অনুশাসন তাঁর মাথায় ছিল। কিন্তু স্বয়ংসেবকরা বেশিরভাগই তখন বয়সে তরুণ, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। তাই গোলওয়ালকরজী ব্যস্ত হলেন একজন সুযোগ্য নেতা খুঁজতে, যিনি এই স্বয়ংসেবকদের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

গঙ্গা আর যমুনা হিমালয়ের কোলে জন্ম নিয়ে ভারতভূমির মধ্যে দিয়ে ধাবিত হয় প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দিকে, সেখানে তারা মিলিত হয়। গোলওয়ালকরজী যেমন করে একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের নেতার সন্ধান করছিলেন, তেমনি একজন নেতা তৈরি হয়ে একটি পার্টি তৈরির কথা ভাবছিলেন। এই নেতার নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শিক্ষাজগতে অসাধারণ সাফল্যের পরে ১৯৩৯ সালে শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতির জগতে এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। প্রথম তিনি ছিলেন হিন্দু মহাসভায়। রাজনীতিতে আসার মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী মন্ত্রী—প্রথম স্থানে মুখ্যমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী) ফজলুল হক। এই মন্ত্রিসভাকে সাধারণত শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা বলা হত। ব্রিটিশ গভর্নর হারবার্ট-এর

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল, মুসলিম লীগ হকসাহেবকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলল কিন্তু ইতিমধ্যে শ্যামাপ্রসাদ রঙ্গমঞ্চে এসে গেছেন। তিনি হক সাহেবকে টেনে মুসলিম লীগের খপ্পর থেকে বের করে আনলেন এবং নিজের হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কৃষক প্রজাপার্টির জোট তৈরি করে ১৯৪১ সালে এক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন যাতে প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে ওই নামেই ডাকা হত) হলেন ফজলুল হক এবং অর্থমন্ত্রী হলেন শ্যামাপ্রসাদ। এই মন্ত্রীসভারই ডাক নাম ছিল 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা'। এটি একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সরকার চালনা করেছিল, যার সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন সে সময়ের অন্যতম মুসলিম নেতা আবুল মনসুর আহমদ, তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর' বইতে। ফজলুল হক নিজে বলেছিলেন, 'এই বাংলায় আমি নিয়েছি হিন্দুর স্বার্থরক্ষা করার দায়িত্ব, আর শ্যামাপ্রসাদ নিয়েছেন মুসলিমের স্বার্থরক্ষা করার দায়িত্ব।' যে লোক শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে তারা হয় মূর্খ, কারণ এই ইতিহাস তারা জানে না, আর না হয় মিথ্যাবাদী, জেনেও চেপে যায়।

শ্যামাপ্রসাদের অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্তের এখানেই শেষ নয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম একসময় দেনায় ডুবে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, আর একই সময়ে তাঁর স্ত্রী দুরারোগ্য অসুখে পড়েছিলেন। হক সাহেব পর্যন্ত তাঁর জন্য বিশেষ কিছু করেননি। একথা যখন শ্যামাপ্রসাদের কানে গেল তখন তিনি শুধু নিজের খরচে নজরুলের স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন না, তাঁদের দু'জনকে নিজের মধুপুরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, হাওয়া বদল করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য, বলা বাহুল্য সব নিজের খরচে। শুধু তাই নয়, নজরুলের দেনাও তিনি শোধ করবার ব্যবস্থা করলেন। এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নজরুল শ্যামাপ্রসাদকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা মর্মস্পর্শী।

পুরো চল্লিশের দশক জুড়ে শ্যামাপ্রসাদ নিজের অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভার একের পর এক স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ব্রিটিশের চক্রান্তে যে পঞ্চাশের মন্বন্তর হয়েছিল, (ইংরেজি ১৯৪৩ সালে) যাতে কলকাতার রাস্তা জুড়ে না-খেয়ে মরে যাওয়া মৃতদেহ পড়ে থাকত, তাতে অসামান্য ত্রাণকার্য করেছিলেন। সে সময়ের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সরবরাহ মন্ত্রী (পরে প্রধানমন্ত্রী) হুসেন সোহরাওয়ার্দি এই দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে যে চুরিচামারি করেছিল তার মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তারপরে কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির হিন্দুহত্যায় মুসলিম লীগের জঘন্য সাম্প্রদায়িক ন্যাক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নোয়াখালিতে অগণিত হিন্দুকে জোর করে গরুর মাংস খাইয়ে মুসলমান করা হয় এবং তেমনি অগণিত হিন্দু মহিলা মুসলিমদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। সে সময় কোনো হিন্দু মহিলা ধর্ষিতা হলে সমাজ তাঁকে ত্যাগ করত, ধর্মান্তর করা বা পতিতাবৃত্তি করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার থাকত না। এই বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণকে উল্টে দেওয়া, ধর্ষিতা মহিলাদের হিন্দু সমাজে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব পুরো শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে অমূল্য সাহায্য করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন।

১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা পাবার পর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর ঢল নামল। এই ঢল আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৭ সালেই, ১৯৫০ সাল পূর্ব পাকিস্তান সরকার

বাজপেয়ী বলেন, জনতা পার্টির বাকি শরিকদের সঙ্গে আমাদের মাত্র দু বছরের সম্পর্ক—আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের চিরকালের সম্পর্ক। অতএব রইল তোমার জনতা পার্টি, আমরা চললাম। তারপর জনসঙ্ঘীরা বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করলেন, সিদ্ধান্ত করলেন যে তাঁরা পুরনো নাম 'জনসঙ্ঘ' ও পুরনো প্রতীক 'প্রদীপে' ফিরে যাবেন না। নতুন পার্টির নাম হল ভারতীয় জনতা পার্টি, প্রতীক পদ্মফুল, প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী। এটা ঘটল, ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ সাল।

আমাদের পার্টির জন্মের এটাই ইতিহাস। ও হ্যাঁ, যে জনতা পার্টি ছেড়ে অটলবিহারীর নেতৃত্বে প্রাক্তন জনসঙ্ঘীরা বেরিয়ে এসেছিলেন সেই সাবেক জনতা পার্টি আর কয়েক বছরের মধ্যেই উঠে যায়।

প্রশ্ন ৪। শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বা মুখার্জী) 'বাংলার বাঘ' নামে খ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৯০১ সালে। অসাধারণ ভাল ছাত্র ছিলেন। বি.এ. ও এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন, তারপর বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারও হয়েছিলেন, কিন্তু আইনব্যবসা বিশেষ করেননি। শিক্ষাজগতে আত্মনিয়োগ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন খুবই অল্প বয়সে। তারপর রাজনীতিতে প্রবেশ, ১৯৩৯ সালে। তাঁকে যাঁরা রাজনীতিতে আনেন তাদের মধ্যে অন্যতম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এবং প্রাক্তন লোকসভার 'লাল অধ্যক্ষ' সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা প্রখ্যাত ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

রাজনীতিতে প্রবেশের দু'বছরের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, যা শুধু তাঁর মতো মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকমভাবে; ১৯৩৭ সালে বাংলায় যে নির্বাচন হল তাতে প্রধান দল ছিল তিনটি; কংগ্রেস, প্রধানতঃ হিন্দু সমর্থিত; মুসলিম লীগ, প্রধানতঃ মুসলমান ভূস্বামী ও অন্যান্য অবস্থাপন্ন সমর্থিত; এবং কৃষক প্রজা পার্টি, প্রধানতঃ মুসলিম চাষী সমর্থিত। এই তিনটি দলের কোনটিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হক (যাঁকে বাংলাদেশে 'শেরে বাংলা' বলা হয়) অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন, মুসলিম লীগকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুর্বলচিত্ত ছিলেন। তিনি প্রাণপণে চেয়েছিলেন ও চেষ্টা করেছিলেন যাতে তাঁর পার্টির সাথে কংগ্রেস কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু কংগ্রেসের তদানীন্তন মাথামোটা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতারা এতে সম্মত হয়নি, ফলে ফজলুল হককে সেই মুসলিম লীগের সঙ্গে গিয়ে জোট করতে হয়। সে সময় যদি কংগ্রেস সম্মত হত তা হলে দেশভাগই হত না। মুসলিম লীগের কাছে যাবার আগে হক সাহেব খেদে কংগ্রেসকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলে।'

ফলে অসময়ে, মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে, ২৩ জুন ১৯৫৩ তারিখে মৃত্যু হয় ভারতমাতার এই বীর সন্তানের। তাঁর মৃত্যুরহস্যের ওপর থেকে আবরণ কোনদিন সরবে কি না কেউ জানে না। কিন্তু তিনি অগণিত দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর চিত্তে চিরকাল অমর হয়েই থাকবেন।

প্রশ্ন ৫। বিজেপি অফিসে শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া আর কার কার ছবি রাখা হয়?

উত্তর ঃ দু'জনের ছবি রাখা অত্যাবশ্যক, এক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সভাপতি, এবং দুই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ভারতীয় জনতা পার্টির দর্শন 'একাত্ম মানববাদ' প্রণেতা। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের ছবি প্রায় সর্বদাই রাখা হয়, কারণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের প্রেরণার উৎস ছিলেন স্বামীজী, বর্তমান পার্টির প্রেরণার উৎসের মধ্যেও স্বামীজী একটা বিরাট স্থান অধিকার করে আছেন। এছাড়া বাজপেয়ীজী, আদবাণীজী ও বর্তমান পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতির ছবিও রাখা উচিত। এছাড়া রাখা যেতে পারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ারজী, গুরুজী গোলওয়ালকার এবং জয়প্রকাশ নারায়ণজীর ছবি। পার্টির যে কোন অনুষ্ঠান শুরু করার সময়ে প্রথমেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং পণ্ডিত দীনদয়ালজীর ও ভারত মাতার ছবিতে মালা দিয়ে শুরু করতে হবে।.

প্রশ্ন ৬। বিজেপি-র পার্টি সঙ্গীত কি?

উত্তর ঃ বিজেপি-র পার্টি সঙ্গীত হচ্ছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'বন্দেমাতরম্'। এর আজকাল নানারকম নতুন সুর বেরিয়েছে, কিন্তু বিজেপি-র অনুষ্ঠানে এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া প্রাচীন সুরেই গাইতে হবে। অনেকেই জানেন না যে বন্দেমাতরম্ আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতও বটে, 'জনগণমন অধিনায়ক'-র পাশেই এর স্থান, কিন্তু সে বন্দেমাতরম্' সম্পূর্ণ গান নয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা গানটি খানিকটা সংস্কৃতে, খানিকটা বাংলায়, কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে শুধু গোড়ার সংস্কৃত অংশটিই মর্যাদা পেয়েছে, কারণ পরের অংশটিতে 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীং" ইত্যাদি কথা আছে, এতে আমাদের সংখ্যালঘু-পূজক কংগ্রেসের সেকুলার ভাবধারা যদি চোট খায়। কিন্তু বিজেপি-র সঙ্গীতে এইসব ভণ্ডামি নেই, পুরো গানটিই গাওয়া হয়।

প্রশ্ন ৭। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ দীনদয়ালজী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন, অসময়ে আততায়ীর হাতে অপঘাত মৃত্যু যাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ (এই তারিখটি এখন আমরা সমর্পণ-দিবস হিসাবে পালন করি) তারিখে বর্তমান রাজস্থানের আজমীরের নিকটবর্তী ধনকিয়া গ্রামে দীনদয়ালজীর জন্ম। ওঁদের বাড়ি কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলায়। দীনদয়ালজীর তিন বছর বয়স হবার আগেই তাঁর পিতা গত হন, এবং দীনদয়ালজী মামার বাড়িতে মানুষ হন। ছাত্র

সুপরিকল্পিতভাবে সেদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়নের ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি লোক বিনিময় হয়ে গেছে—পূর্ব (ভারতীয়) পাঞ্জাব থেকে সমস্ত মুসলমান পশ্চিম (পাকিস্তানী) পাঞ্জাবে চলে গেছেন, অনুরূপভাবে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখ ভারতে চলে এসেছেন। যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়ন আরম্ভ হল তখন শ্যামাপ্রসাদ লোকসভায় নেহরুকে প্রস্তাব দিলেন, দুই বাংলার মধ্যেও পাঞ্জাবের মতো লোক বিনিময় হোক। নেহেরুর চোখ তখন মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের দিকে। তিনি লম্বা-চওড়া কথা বলে লোক বিনিময়ে সম্মতি দিলেন না—যদি দিতেন তবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একমুখী হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ ও দণ্ডকারণে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। শুধু তাই নয়। যে পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের সুপরিকল্পিতভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল সেই সরকারের সঙ্গেই নেহরু এক চুক্তি করলেন, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে প্রত্যেক সরকারই তার নিজের নিজের সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এ যেন চোরকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হল কোষাগারের দরজা পাহারা দেবার। এই কুখ্যাত চুক্তির নাম দিল্লী চুক্তি বা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি, সই হয়েছিল ৮ই এপ্রিল ১৯৫০।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা তৈরি হয় তাতে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বছরের মন্ত্রিত্বকালীন উদ্বাস্তু সমস্যা ও দেশভাগ জনিত অন্যান্য সমস্যা (সে সময় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল) কণ্টকিত পশ্চিমবঙ্গকে শ্যামাপ্রসাদের উপহার চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন কারখানা এবং দামোদর উপত্যকা সংস্থা (ডি ভি সি)। কিন্তু নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ভণ্ডামি (বা রাজনৈতিক মূর্খামি) শ্যামাপ্রসাদ সহ্য করতে পারলেন না, পদত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গেই পদত্যাগ করলেন বাংলার অন্য মন্ত্রী, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। পদত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলেন তখন যে জনসমুদ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য তৈরি হয়েছিল তার তুলনা তারপরে আর দেখা যায়নি।

বাংলার পর শ্যামাপ্রসাদের চোখ পড়ে কাশ্মীরের দিকে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি তখন সম্পূর্ণ, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী শেখ আবদুল্লার পরামর্শে নেহরু কাশ্মীরের জন্য একগুচ্ছ আলাদা নিয়মকানুন সৃষ্ট করে রেখেছেন। এর মধ্যে অন্যতম সংবিধানের ৩৭০ ধারা যা এখনও আছে—এছাড়াও ছিল কাশ্মীরের আলাদা পতাকা। কাশ্মীরের রাজপ্রমুখকে অন্যান্য 'খ' শ্রেণির রাজ্যের মতো রাজপ্রমুখ বলা হত না, বলা হত সদর-ই-রিয়াসৎ। কিন্তু সবচেয়ে লজ্জাজনক ছিল পারমিট-ব্যবস্থা, যার ফলে কোনো ভারতীয় নাগরিককে কাশ্মীর যেতে হলে আলাদা করে ছাড়পত্র নিতে হত। শ্যামাপ্রসাদ আওয়াজ তুললেন—'এক দেশ মে দো নিশান, দো বিধান, দো প্রধান, নেহি চলেগা, নেহি চলেগা, নেহি চলেগা।' এবং যেই কথা সেই কাজ। পারমিট ছাড়াই শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে ঢুকলেন এবং পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন।

তারপরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। ইচ্ছে করে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁকে রাখা হয়েছিল। হার্ট অ্যাটাকের পর তাঁকে হাঁটিয়ে দোতলায় তোলা হয়েছিল। তারই

প্রশ্ন ৮। দীনদয়ালজী প্রণীত বিজেপি-র দর্শন 'একাত্ম' মানববাদ বিষয় কিছু জানতে চাই?

উত্তর ঃ নিজের স্বল্পস্থায়ী জীবনকালের মধ্যে দীনদয়ালজী তাঁর গভীরে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে পশ্চিমী রাজনৈতিক মতগুলি ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না। পশ্চিমী মত বলতে একদিকে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ—এগুলি বিরোধী মত, এবং এগুলি ভারতে ব্যর্থ হচ্ছে কারণ, দীনদয়ালজীর মতে, দুটি। প্রথমতঃ এই মতগুলি মানবতার ওপর জোর দিচ্ছে না, এবং দ্বিতীয়তঃ এই মতগুলি সমাজের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাচ্ছে। ধনতন্ত্রের চোখে মানুষ পণ্য তাকে পয়সা দিয়ে যেমন খুশি কেনাবেচা যেতে পারে তা কাজে লাগলে যেমন যত্ন করতে হবে তেমনি কাজ ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াও যাবে। সমাজতন্ত্রের (সাম্যবাদের চোখে আর বেশি করে) চোখে মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্রের এক ছোট, অংশ, তার কেন আলাদা অস্তিত্বই নেই। যে রাষ্ট্রদাস হয়েই জন্মেছে, রাষ্ট্রদাস হয়েই তাঁকে মরতে হবে (এটা পশ্চিমবঙ্গে বদলেছে, রাষ্ট্রদাসের' জায়গায় পার্টিদাস) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বলার কোন সুযোগ তার নেই। ধনতন্ত্র যেমনি মানুষের অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে শুধু মাথা ঘামায় তেমনি সমাজতন্ত্রও তাই, শুধু পরিপ্রেক্ষিতটা আলাদা—একটা তত্ত্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, অন্যটা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক উদ্যোগের দৃষ্টিকোণ থেকে।

একাত্ম মানববাদের চোখে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' একাত্ম মানববাদে মানুষ অমৃতের সন্তান, পণ্যও নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশও নয়। একান্ত মানববাদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বাস করে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও সুনিশ্চিত করতে চায় যে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে না। সফল মানুষ ও ব্যর্থ মানুষ, দু'দলই সমাজে থাকবে। একাত্ম মানববাদের চোখে অর্থনীতি মানুষের একটা ছোট্ট অংশমাত্র, অন্যান্য অংশের মধ্যে আছে মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা, মানুষের সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানচিন্তা ইত্যাদি। মানুষের উন্নতি মানে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উন্নতিও বটে। কারণ মানুষ শুধু অর্থনৈতিক জীব নয়। এর আগে কোন রাজনৈতিক দর্শন এত গভীরভাবে মানুষের অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য দিকগুলি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। রাষ্ট্রের কাজ মানুষের দাবিয়ে রাখা নয়, মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করা। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশেরই অন্য নাম 'পরম বৈভব', চার পুরুষার্থ, অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ চরিতার্থ করা, তাদের মধ্যে ভারসাম্য রেখেই জীবনযাপন করা।

প্রশ্ন ৯। বিজেপি-র পঞ্চনিষ্ঠা বা পঞ্চপ্রতিশ্রুতি' সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ উপরিলিখিত দর্শন একাত্ম মানববাদের সারাংশ নিহিত আছে পঞ্চনিষ্ঠা-র মধ্যে। এই পঞ্চনিষ্ঠা হল নিম্নরূপ:

(ক) জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি (খ) গণতন্ত্র (গ) সর্বধর্মসমভাব (ঘ) বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি (ঙ) নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি

হিসাবে অসাধারণ ছিলেন, আজমীর বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন, অঙ্কশাস্ত্রকে সাম্মানিক বিষয় হিসেবে নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাশ করেন। তারপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ডাকে সঙ্ঘে প্রচারক হয়ে যোগদান করেন।

পাঁচ বছরের মধ্যে দীনদয়ালজী যুগ্ম প্রান্ত প্রচারকের পথে উন্নীত হন। ১৯৫১ সালে যখন ভারতীয় জনসংঙ্ঘ তৈরি হয় তখন তিনি গুরুজী কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং উত্তরপ্রদেশের পার্টি সম্পাদক নিযুক্ত হন। জনসঙ্ঘের কানপুর অধিবেশনের সময়ে শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে উন্নীত করেন। এই পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করার সময় তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, আমি যদি দুটো দীনদয়ালকে পেতাম তাহলে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রই বদলে দিতাম।

এরপরেই শেখ আবদুল্লার কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়, এবং পার্টি চালাবার দায়িত্বের বৃহদাংশ দীনদয়ালজীর ঘাড়েই এসে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সে-কাঁধ যথেষ্ট চওড়া ছিল। দীনদয়ালজীর অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তি এবং নিরলস পরিশ্রমের ফল ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোন রাজনৈতিক পার্টির জন্মের মাত্র ষোল বছরের মধ্যে এই ঘটনা বিস্ময়কর।

এই সময়ের মধ্যে দীনদয়ালজী শুধু সংগঠনের কাজে ডুবে থাকেননি, দৈনিক 'স্বদেশ' এবং 'সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকা দুটি চালিয়েছেন। 'চালানো' মানে শুধু সম্পাদনা নয়। প্রবন্ধ ও সংবাদ জোগাড় করেছেন, কম্পোজ করেছেন, ছাপার কাজ তদারক করেছেন, এমনকি কাগজ কাটা এবং ফেরিওয়ালার হাতে দেওয়ার কাজেও হাত লাগিয়েছেন। এর মধ্যে হেডগেওয়ারজীর জীবনী মারাঠী থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিষয়ে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এবং সর্বোপরি ভারতের সনাতন ধর্মের চার পুরুষার্থ, অর্থাৎ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে ভারতের বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে, 'একাত্ম মানববাদ' নামক দর্শন লিখেছেন, যা আজ বিজেপির পাথেয়। এই সময়টা আগাগোড়া তিনি পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। এবং জীবনের অন্তিম লগ্নে কেরালায় কালিকট অধিবেশনের পরে পার্টির সভাপতিত্বও করেছেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে যখন তাঁর বয়স মাত্র বাহান্ন, তখন মোগলসরাই রেল ইয়ার্ডের মধ্যে এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে একজন রেলকর্মী তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। স্পষ্টতই তাঁকে খুন করে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড কে বা কারা ঘটাল তা কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ আবিষ্কার করতে পারেনি। মৃত্যুর পর তাঁর ভূয়সা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল ভারতের তাবড় রাজনৈতিক নেতা। নাথপাই তাঁকে গান্ধী, তিলক ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছিলেন, এমনকি কমিউনিস্ট হীরেন মুখোপাধ্যায়ও তাঁকে 'অজাতশত্রু' বলেছিলেন। এভাবেই এই মনীষীর জীবন শেষ হবে, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন তাঁর মৃত্যুর পর সার্থক হয়েছে।

নির্দেশ আসত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি মারফত। তখন ঠাট্টা করে বলা হত, মস্কোয় বৃষ্টি নামলে ভারতের কমিউনিস্টরা চাঁদনী রাতেও ছাতা খুলে ফেলে। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল তখন জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ। যুদ্ধ প্রথমে বেধেছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির এবং এই অনাক্রমণ চুক্তি হেতু সোভিয়েতরা নিষ্ক্রিয় ছিল। প্রায় দুবছর বাদে আমেরিকা এসে এই যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়। যেহেতু যুদ্ধে সে সময় সোভিয়েতরা নিষ্ক্রিয়, সেজন্য ভারতের কমিউনিস্টরা এর নাম দিল Imperialist War'—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।'

কিন্তু এর পরেই পাশা উল্টে গেল। জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে সোভিয়েতকে আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে এখনকার কমিউনিস্টদের চোখে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি 'জনযুদ্ধে' পরিণত হয়ে গেল, ইংরেজিতে তার নাম হল Peoples, War। যতদিন যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ছিল ততদিন ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের সুনজরে দেখত না। কিন্তু পাশা উল্টোবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টরা হয়ে গেল ব্রিটিশ সরকারের পোষা কুকুর, তাদের জন্য ব্রিটিশ সরকারের স্নেহ একেবারে গলে গলে পড়তে লাগল। ১৯৪২ সালে তখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল তখন কমিউনিস্ট পার্টি সর্বতোভাবে তার বিরোধিতা করল।

ইতিমধ্যে ভারতের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন জার্মানীর উদ্দেশ্যে। সেখানে থেকে তিনি একটি সাবমেরিনে করে চলে এলেন জাপানে, জাপান থেকে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর তখন জাপানীরা ব্রিটিশদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী (যারা কিছু অংশ ব্রিটিশ, বেশিরভাগই ভারতীয়) তখন জাপানীদের যুদ্ধবন্দী। নেতাজী তাদের মধ্যে থেকে ভারতীয় অফিসার এবং সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে দেশপ্রেমের ডাক দিলেন, আর ওঁদের বেশিরভাগই বেরিয়ে এলেন, তাঁর ডাকে, গঠিত হল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (সংক্ষেপে আই.এন.এ) বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাদের শীর্ষে থেকে নেতাজী চলে এলেন বর্মা (বর্তমান মায়ানমার) অতিক্রম করে। ভারতভূমিতে পা রাখলেন মণিপুরের মৈরাঙ গ্রামে।

এই সময় ব্রিটিশের চামচাগিরিতে রত ভারতের কমিউনিস্টরা নেতাজীকে দেয়নি এমন কোন গালি নেই। বিশ্বাসঘাতক, তোজোর (তোজো ছিলেন সে সময়কার জাপানের প্রধানমন্ত্রী), কুকুর, সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর; কুইসলিং (নরওয়ের বিশ্বাসঘাতক প্রধানমন্ত্রী) দেশদ্রোহী ইত্যাদি বিশেষণে তাকে ভূষিত করেছে। সে সময় তারা 'জনযুদ্ধ' বলে একটা কাগজ বার করত, তাতে কার্টুন থাকত জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজোর হাতে শেকলে বাঁধা একটা কুকুর, তার মুখটা নেতাজীর। আর এই সব কাগজ ফিরি করার দায়িত্ব ছিল কার? জ্যোতি বসুর, আবার কার?

এখন শুনলে হাসি পায়, জ্যোতি বসুর 'উন্নততর' মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ ভট্টাচার্য তেইশে জানুয়ারি নেতাজীর মূর্তিতে মালা দিতে এসে বলে 'নেতাজী সম্বন্ধে আমরা ভুল করেছিলাম।' শুধু ভুল স্বীকার করলেই হবে, কমরেড ভুলের মাশুল দিতে হবে না?

এগুলি ব্যাখ্যা করতে যে পরিসর প্রয়োজন তা এখানে নেই, কিন্তু ব্যাখ্যা ছাড়াও বিষয়গুলি বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য, এই পাঁচটি প্রতিশ্রুতির, যা বিজেপি-র রাজনীতির ভিত্তিরূপ তার মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাওয়া গেল কি?

প্রশ্ন ১০। বিজেপি-বিরোধীরা রটায় বিজেপি-র স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অবদান নেই, অটলবিহারী বাজপেয়ী নাকি ১৯৪২ সালে ব্রিটিশের সহায়তা করেছিলেন। এসব কি সত্যি?

উত্তর ঃ যাদের নিজেদের চরিত্রের ঠিক-ঠিকানা থাকে না প্রায়ই দেখা যায় তারা অতি সহজেই অন্যের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করে দেয়।। বাংলা প্রবাদে এর অন্য নাম 'চোরের মায়ের বড় গলা।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কমিউনিস্টদের ন্যাক্কারজনক ও জঘন্য দেশদ্রোহী ভূমিকা (যা পরে বিবৃত হয়েছে—১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য) ঢাকবার জন্যই এইসব মিথ্যাচার।

এটা শুধু মিথ্যাচার নয়, গর্দভের মত কথাটাও বটে। কারণ বিজেপি-র জন্ম মোটে, ১৯৮০—এমন কি তার পূর্বসূরী জনসঙ্ঘের জন্মও ১৯৫১ সালে—আর দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে ১৯৪৭ সালে। তা হলে কিভাবে বিজেপি বা জনসঙ্ঘের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া সম্ভব। তা হলে তো বলতে হয় পলাশীর যুদ্ধে কমিউনিস্টদের বা মমতা ব্যানার্জীর কোন অবদান নেই, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (যাকে ভুল করে অনেকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেন) কংগ্রেসের কোন অবদান নেই।

কিন্তু মিথ্যাবাদীরা কি এতেও দমে? তারা বলে, বিজেপি জনসঙ্ঘ ছিল না, কিন্তু আর.এস.এস. (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, সংক্ষেপে সঙ্ঘ) তো ছিল। তারা কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি।

এর সোজা উত্তর আর একটি প্রতিপ্রশ্ন ঃ রামকৃষ্ণ মিশন, বিশ্বভারতী বা হাওড়া কুষ্ঠকুঠীর কি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল? নেয়নি, কারণ এগুলি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে পারে। সঙ্ঘও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, কখনো ছিল না। যদি হত তবে ভারতীয় জনসঙ্ঘ তৈরির (৩নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য) কোন দরকারই হত না, সঙ্ঘ সরাসরিই রাজনীতিতে নামতে পারত।

১৯৪২ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর বয়স ছিল মাত্র সতেরো। সতেরো বছরের কিশোর প্রাপ্তবয়স্কই নয়, তার ব্রিটিশকে সহায়তা করার কোন প্রশ্নই নেই। পুরো ব্যাপারটা কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের পরিকল্পিত রচনা, এর মধ্যে সত্যের ছিটে ফোঁটাও নেই। কিন্তু এই প্রশ্ন আরও গুরুতর প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে; ১৯৪২ সালে জ্যোতি বসুর বয়স ছিল আটাশ। সে সময়ে এই আটাশ বছরের দামড়া জ্যোতি বসু কী করছিল? এ বিষয়ে পরবর্তী (১১নং) প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১১। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা ছিল?

উত্তর ঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, জঘন্য ন্যাক্কারজনক ভূমিকা ছিল। সে সময় ভারতের কমিউনিস্টরা অন্ধভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশ অনুসরণ করত এবং সেই

কমিউনিস্ট পার্টির অবদান ঋণাত্মক, কারণ তারা ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ আরও কঠিন করে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই গাণিতিক বিশ্লেষণ এই নিবন্ধকারেরই করা।

এর সঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। কংগ্রেসের অবদান ৩৫ শতাংশ হলেও তা পুরোপুরি নিরর্থক হয়ে গেছে দেশের বিভাজনে সাত-তাড়াতাড়ি কংগ্রেস সম্মতি দিয়ে বসায়। এই সম্মতির পেছনে কংগ্রেসের চালিকাশক্তি ছিল কাঁচা লোভ, আর কিছু নয়—ক্ষমতার লোভ। এই দেশভাগের ফলে যে কত বড়ো সর্বনাশ হয়েছে তা বলে বোঝানো কঠিন। এর জন্য 'ভারত ও বাংলার সর্বনাশ' নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১৩। সিপিএম আমাদের গান্ধী হত্যার জন্য দায়ী করে? এটা কী ঠিক?

উত্তর ঃ ডাহা মিথ্যা, এর মধ্যে সত্যের কোন ছিঁটেফোঁটাও নেই। প্রথম কথা গান্ধী হত্যা হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে, আর ভারতীয় জনসঙ্ঘের জন্ম হয় ১৯৫১ তে, বিজেপির তো ১৯৮০ তে। তা হলে কী করে এ ব্যাপারে জনসঙ্ঘের বা বিজেপির কোন দায় থাকতে পারে? যদি অভিযোগ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে হয় তাহলে প্রতিপ্রশ্ন, কেন এই হত্যার ব্যাপারে সরকার সঙ্ঘের কারুকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি, শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা? সে সময়কার কংগ্রেস সরকার তো সঙ্ঘের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। আসলে সঙ্ঘের সঙ্গে গান্ধীহত্যার সুদূরতম কোন সম্পর্ক নেই, সরকার শুধু সন্দেহের বশে সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন ১৪। এটা তো আশ্চর্য! ব্রিটিশদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা বা গান্ধীহত্যা সম্বন্ধে আমাদের নামে সিপিএম যে অভিযোগ করে তা ডাহা মিথ্যে তা তো বোঝা গেল। তাহলে মিথ্যা জেনেও এমন অভিযোগ করে কেন?

উত্তর ঃ করে এই জন্য, যে মিথ্যা কথা বলা এবং মানুষকে প্রবঞ্চনা করা কমিউনিজনের একটি গোড়ার কথা। তৃণমূলী এবং কংগ্রেসীরাও মোটামুটি কম্যুনিস্টদেরই অনুসরণ করে। 'পার্টির কাজ এগিয়ে নেবার জন্য' পার্টি থেকে ওদের এই ধরনের মিথ্যা বলার নির্দেশ সর্বদাই জারি হয়ে থাকে। ওদের গুরু লেনিন (সবশেষ খবর অনুযায়ী দুরারোগ্য যৌনরোগে যার মৃত্যু হয়েছিল) বলেছিল আমাদের শত্রুদের বুকে কয়েদীর ব্যাজ ঝুলিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ যে কোন ভাবে তাদের চরিত্রহনন করতে হবে। বুদ্ধি করে মিথ্যা বললে, বিশেষ করে ছাপার অক্ষরে সেই মিথ্যা কথা দেখলে বহু লোক তা বিশ্বাস করে ফেলে। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ ঃ জ্যোতি বসু নিজে স্বীকার করেছে যে তারা একসময় রটিয়েছিল যে প্রফুল্ল সেন 'স্টিফেন হাউস' নামক বিশাল বাড়িটি কিনেছেন। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন অসাধারণ সৎলোক ছিলেন, এবং শেষ সময়ে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় মারা যান। এমনি মিথ্যাই কমিউনিস্টরা বলে থাকে।

প্রশ্ন ১৫। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএম ইত্যাদি পার্টির সর্বদাই বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক এবং নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার (ইংরেজিতে Secular) বলে থাকে। এগুলোর মধ্যে সত্যতা কতটা?

উত্তর ঃ আদৌ কোন সত্যতা নেই, পুরোটাই মিথ্যা কথা। সেক্যুলার কথাটার

আর ভাবলে দুঃখ লাগে, নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত দল ফরওয়ার্ড ব্লক এখন সিপিআই (এম)-এর পদলেহন করছে, নেতাজীর "ঝাঁসির রাণী" বাহিনীর নায়িকা লক্ষ্মী সেহগল সেই সিপিআই (এম)-এর টিকিট নিয়ে রাষ্ট্রপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলেন। ক্ষমতার লোভে মানুষ কত নির্লজ্জ হতে পারে?

প্রশ্ন ১২। ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা কী শুধু কংগ্রেসই ছিনিয়ে এনেছে?

উত্তর ঃ একথা আংশিক সত্য মাত্র যে, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে দেশ ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে তাতে কংগ্রেসের একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু পূর্ণ সত্য হচ্ছে, স্বাধীনতা পেয়ে নিজেরা গদীতে বসবার তড়িঘড়িতে কংগ্রেস অত্যন্ত সহজে দেশভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে দিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ হয়েছে। শুধু তাই নয়। স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেসের যা ভূমিকা তার অন্ততঃ সমান ভূমিকা ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের (ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং ইত্যাদি), নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং ১৯৪৬ সালের মুম্বাইয়ের নৌবাহিনীর বিদ্রোহকারীদের। বস্তুত ইংরেজ এই দেশ শাসন করছিল সশস্ত্র বাহিনীর জোরে, যারা ১৯৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে আর কখনও ব্রিটিশের বিরুদ্ধচারণ করেনি। কিন্তু তার প্রায় নব্বই বছর পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনীর বিচার এবং মুম্বইয়ের নৌবিদ্রোহ দেখে ব্রিটিশরা এই সিদ্ধান্তে আসে যে এই সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আর ভরসা রাখা যাবে না, এবং তখনই স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন নেতাজী বিদেশে (সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে নরপিশাচ স্তালিনের কারাগারে বন্দী), বিপ্লবীরা সবাই হত এবং নৌবিদ্রোহের নায়করা কারাগারে। ফলে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করার জন্য ছিল শুধু কংগ্রেসই। সেই ঘটনার সূত্র ধরে কংগ্রেস দেশের ইতিহাস লেখার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনের অন্যান্য অধ্যায় বাদ দিয়ে দিল, এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের একমাত্র ধ্বজাধারী হিসেবে মানুষের মন জয় করে নিল। আজ যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাই ১০-১২ শতাংশ মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দেবেনই, তা সে কংগ্রেস যতই সিপিএম-এর পদলেহন করুক, তার কারণ এই ভুল ধারণা। যদি গাণিতিক হিসেবে দেখা যায় তবে (মোটামুটিভাবে) ধরা যেতে পারে স্বাধীনতা পাবার পেছনে বিভিন্ন মানুষ ও সংগঠনের অবদান নিম্নরপ :

গান্ধী-পূর্ববর্তী রাষ্ট্রনায়কগণ (যথা তিলক, গোখলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি	১০ %
অগ্নিযুগের বিপ্লবীগণ	১৫%
গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস	৩৫%
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ	৩০%
নৌবিদ্রোহের নেতারা	২০%
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি	(-) ১০%
মোট	১০০%

প্রশ্ন হচ্ছে এই সব কংগ্রেসী কম্যুনিস্ট ঘরানার দলগুলি, যারা নিজেদের 'সেক্যুলার' বলে, তারা কেন এরকম ভণ্ডামি করে? এর উত্তর, মুসলমানের ভোটের লোভে। মুসলমানদের একটা প্রথা আছে, ওরা মসজিদের ইমামের কথা শুনে ভোট দেন, অন্ততঃ ওদের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ তাই দেন। অপরপক্ষে হিন্দুদের এরকম কোন ধর্মীয় সংস্থা নেই যারা তাদের রাজনীতিতে নাক গলায়। এর ফলে মুসলমানের ভোটের লোভে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সদৃশ পার্টির নেতাদের জিভ বেড়িয়ে পড়ে। দু'কষ দিয়ে লালা গড়ায়। মুসলমানের ভোটের জন্য এরা নিজের মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে পারে এবং এই ভোটলোলুপতা ঢাকার জন্যই এরা বিজেপির দিকে তাকিয়ে 'সাম্প্রদায়িক, সাম্প্রদায়িক' বলে চিৎকার করে। বিজেপি কি মুসলমানের ভোট চায় না? নিশ্চয়ই চায়, কিন্তু তার জন্য বিজেপি এরকম নির্লজ্জতা, এরকম বেহায়াপনা, এরকম ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নয়।

প্রশ্ন ১৬। বিজেপি সবসময়েই 'হিন্দুত্বে'র কথা বলে। এই হিন্দুত্ব ব্যাপারটা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়?

উত্তর ঃ মোটেই না, হিন্দুত্ব কখনোই সাম্প্রদায়িকতা নয়। 'হিন্দু' কথাটা কোথা থেকে এল? সিন্ধুনদীর অপরপারে যারা বাস করত, তাদেরকে প্রাচীন পারসীকরা হিন্দু বলত—আসলে হিন্দু শব্দটা সিন্ধু-রই এই রকমফের মাত্র। সেই অর্থে ভারতীয় মাত্রেই হিন্দু। ধর্মের দিক দিয়ে যদি বলা যায় তাহলে দেখা যাবে দেশের সমস্ত মানুষই এখন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী বা আগে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তাঁরা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাতে কোন অসুবিধা নেই—কিন্তু ভারতের যে গৌরবময় হিন্দু অতীত, যা বেদপ্রণেতা ঋষিদের থেকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে তার তো অংশীদার তারাও। আমরা চাই তাঁরা সেই অর্থাৎ সম্বন্ধেই গর্ব অনুভব করুন, সঙ্গে নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও গর্বিত হোন। এই প্রাচীন অতীতের অংশীদারত্বের নামই হিন্দুত্ব। এতে কোন সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাওয়া গেল কি?

অন্যভাবে দেখলেও, হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত হতে পারে না, তাই হিন্দুত্ব কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। এই হিন্দুধর্মে জন্মেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'যত মত তত পথ'। কই আর কোন ধর্মের কোন প্রবক্তার মুখে তো এমন কথা শোনা যায়নি। হিন্দুধর্মের বহু মত প্রচলিত আছে, এমনকি নাস্তিক হয়েও মানুষ হিন্দুধর্মে থাকতে পারেন। এই ধর্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত হয়নি, কোন বিশেষ পুস্তকেও এই ধর্ম আবদ্ধ নয়। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট স্বয়ং বলেছেন, হিন্দুত্ব কোনো ধর্ম নয় এটি একটি জীবনধারা। হিন্দুত্ব আর সাম্প্রদায়িকতা যে পরস্পরবিরোধী তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, দেশভাগের পর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান তার সমস্ত হিন্দুকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু হিন্দু ভারত তাঁর সমস্ত মুসলিমকে সম্মানিত নাগরিক করে রেখে দিয়েছে। এটা হিন্দুত্বেরই প্রকাশ।

প্রশ্ন ১৭। মুসলমানদের সম্বন্ধে বিজেপির ভাবনাচিন্তা কী?

উত্তর ঃ ভাবনাচিন্তা আবার কী? হিন্দুদের জন্য যা ভাবনাচিন্তা, শিখ, বৌদ্ধ,

মানে, 'যার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, জাগতিক ইত্যাদি। 'সাম্প্রদায়িক মানে যারা একটি সম্প্রদায়কে বিশেষ করে টানে। এবার দেখা যাক, এই সব সংজ্ঞা অনুযায়ী বিজেপি কতটা সাম্প্রদায়িক, আর কংগ্রেস-সিপিএম কতটা ধর্মনিরপেক্ষ।

২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত যে জোট দিল্লীতে ক্ষমতায় আসীন ছিল তার নাম ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (সংক্ষেপে ইউপিএ) অর্থাৎ সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট। এর মধ্যে ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই সরকারকে খাড়া করে রেখেছিল সিপিএম। যদিও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আর কংগ্রেস পরস্পরবিরোধী দল হবার ভান করে, আসলে যে তারা একটি বিশেষ পদার্থের এপিঠ আর ওপিঠ তাতো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু সিপিএম এই ইউপিএ ঠেকা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল কারণ সিপিএম-এর মতো ইউপিএ একটি ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার জোট, যদিও তাদের সব মতামতের সঙ্গে বামদলরা একমত নয় তবু 'সাম্প্রদায়িক বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ জোটের ক্ষমতায় আসা আটকাতে এই ঠেকো দেওয়া অপরিহার্য।

এই ইউপিএ জোটের মধ্যে একটি দল মুসলিম লীগ। এখন কোন সুস্থমস্তিষ্ক লোক বিশ্বাস করবে যে মুসলিম লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ দল? কেউ বিশ্বাস করবে না। যে দলের নামের মধ্যেই মুসলিম কথাটা আছে সে দল কি করে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে সেই প্রশ্নই সবাই করবে। শুধু তা নয়, পুরোপুরিভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এই দল অবিভক্ত ভারতের বিভাজন দাবী করছিল এবং দাবী আদায়ও করেছিল অর্থাৎ পাকিস্তান হাসিল করেছিল (উল্লেখ্য তখন এই মুসলিম লীগেরা বলত 'হাঁথমে বিড়ি/মুঁহমে পান/লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর এখন তারা বলে, লড়কে লিয়া পাকিস্তান/অব হঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান')। সেই পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ থেকে তারা যাবতীয় হিন্দু-শিখকে তাড়িয়ে ছেড়েছিল, পূর্ব অংশ (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকেও তারা বেশিরভাগ হিন্দুকে তাড়িয়েছে। সেই মুসলিম লীগ হল ধর্মনিরপেক্ষ? আর বিজেপি, যারা সব মানুষের জন্য এক আইন চায়, তারা হল সাম্প্রদায়িক। কত মিথ্যাচার আর সহ্য করতে হবে?

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। এঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল জোটবদ্ধ ছিল—১৯৯৮ থেকে ২০০১ আবার ২০০২ থেকে ২০০৮। কট্টর লড়াকু সিপিএম বিরোধিতার জন্য আমরা এঁকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছি। কিন্তু মুসলিম ভোট টানার জন্য এই ভদ্রমহিলা এমন নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা আরম্ভ করেছেন যে তার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতেই হচ্ছে। সিপিএম ওবিসি-র ছলে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে—আর মমতা ফুরফুরা শরীফের পীরের পায়ে ধরে মুসলিম ভোট টানার চেষ্টা করছেন, মুসলিম মহিলাদের মত হিজাব পরে নামাজ পড়ার অভিনয় করছেন। এসব কি ভণ্ডামি? মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই নামাজ পড়বেন, কিন্তু মমতা হিন্দু হয়ে কেন তা পড়বেন? পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু তার ভিতরে নাক গলিয়ে দু নৌকায় চলার চেষ্টা করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

(গ) গুজরাতে যে দাঙ্গা হল তাতে অনেক মুসলিমের প্রাণ গেছে, এটা নিঃসন্দেহে নিন্দার যোগ্য। কিন্তু দাঙ্গা যে শুরু হয়েছিল গোধরার হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পুড়িয়ে মারা দিয়ে সেটা সবাই চেপে যাচ্ছে কেন? এদের পুড়িয়ে মেরেছিল গোধরার কিছু ঘাঁচি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক যার নেতৃত্বে ছিল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার—তাই বা চেপে যাওয়া হচ্ছে কেন?

(ঘ) গুজরাতের দাঙ্গায় মুসলিম হত্যা নিঃসন্দেহে নিন্দাযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে খালেদা সরকার আসার পরে যেভাবে নির্বিচারে হিন্দুহত্যা ও নারীধর্ষণ চলেছিল সে ব্যাপারে মেকিসেকুরা চুপ কেন? কাশ্মীরে সংখ্যাগুরু মুসলমানরা যেভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু পণ্ডিতদের তাড়িয়েছে সেই বিষয়েই বা চুপ কেন?

(ঙ) হিন্দু সমাজের কুপ্রথা নিয়ে মেকিসেকুরা খুব সোচ্চার। সত্যিই হিন্দু সমাজে বেশ কিছু কু-প্রথা ছিল বা আছে যেমন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নরবলি, সতীদাহ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি। এর মধ্যে বেশ কিছু বিদায় হয়েছে। বাকিগুলিও কালক্রমে বিদায় নেবে, সে বিষয়ে সব হিন্দুরই সোচ্চার হওয়া উচিত। কিন্তু মুসলিম সমাজের কুপ্রথা নিয়ে মেকিসেকুদের কি বক্তব্য? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পর্দাপ্রথা! একজন মহিলাকে মাথার ওপর একটা কালো তাঁবু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে কোন্ অপরাধে? কোন মেকিসেকু নারীবাদী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একবার এটা করে দেখুন তো (ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা গরমে হলে আরও ভাল হয়)। উল্লেখ, কামাল আতাতুর্ক ১৯২৩ সালের তুরস্কে পর্থাপ্রথা তুলে দিয়েছিলেন। আমরা কেন এই পৈশাচিক প্রথা তুলে দিচ্ছি না, কমসেকম এর নিন্দা কেন করছি না? (সম্ভাব্য মেকিসেকু জবাব—উঃ, আঁঃ, এসব অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় সাবধানে পা ফেলতে হবে, আচ্ছা, আমার একটু কাজ আছে, এবার উঠি।)

(চ) স্টেইন্স পরিবারের তিনজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ, এই অপরাধীর নিঃসন্দেহে যোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু বালিগঞ্জ ওভারব্রিজের ওপর যে সতেরোজন আনন্দমার্গী সাধুকে সিপিএম জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল (৩০ এপ্রিল, ১৯৮২ তারিখে), অথবা পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে আদিশান্ত দলুইকে সিপিএম জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল (২০০৪ সালের মে মাসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজে স্বীকার করেছে) তার জন্য খুনীদের শাস্তি হওয়া উচিত নয়? অথচ স্টেইন্স পরিবারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে পরিমাণ চিৎকার হয়েছে তার সিকির সিকিও এই দুটি হত্যাকাণ্ডে হয়নি। কেন হয়নি, মেকিসেকুরা কি বিশ্বাস করে যে বাদামী চামড়ার হিন্দুদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে তত পাপ হয় না, যতটা হয় সাদা চামড়ার খ্রিস্টানদের পুড়িয়ে মারলে?

(ছ) কংগ্রেস, সিপিআই (এম) এর সবাই কমবেশি সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা করে। কিন্তু তৃণমূল এদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছে, নির্লজ্জতার সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মুসলিমরা নমাজ পড়েন, আমরা হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করি—ঠিক আছে। কিন্তু নিজে

খ্রিস্টান, পার্শী, ইহুদী সম্বন্ধে যা ভাবনাচিন্তা, মুসলমানদের জন্যও আমাদের তাই-ই ভাবনাচিন্তা। তার কারণ আমরা মুসলমানদের মানুষ হিসেবে দেখি, মুসলমান হিসেবে দেখি না। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখি, ভোটব্যাংক হিসেবে দেখি না, রাষ্ট্রভক্ত হিসেবে দেখি, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ ভক্ত হিসেবে দেখি না। আমরা চাই, মুসলমানরা জাতীয় জীবনের পুরো শরিক হোক অর্থাৎ মূলস্রোতে আসুক। এবং এখানেই আমাদের সঙ্গে তথাকথিত সেক্যুলার পার্টিগুলোর প্রভেদ। এইসব মেকি সেক্যুলার পার্টি চায় মুসলমানরা আলাদা হয়ে থাকুক, তাদের মধ্যে ইংরেজিতে যাকে বলে Ghetto mentality তাই সঞ্চারিত হোক্ (আগে প্রত্যেক ইউরোপীয় শহরে ইহুদীদের থাকার জন্য দেয়াল ঘেরা আলাদা জায়গা থাকত, তাকে Ghetto বলা হত, সেখানে অ-ইহুদী কারুর থাকা বারণ ছিল, এর ফলে ইহুদীদের যে মানসিকতা জন্মেছিল তাকেই (Ghetto mentality) বলে। এর প্রমাণ ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, নামে পরম সেক্যুলার, কিন্তু কাজে কট্টর সাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মহম্মদ সেলিম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব সংখ্যালঘুর জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এখানে 'আলাদা' কথাটাই আসল। এই থেকেই মেকি—সেক্যুলারদের মুসলমানদের সম্বন্ধে মানসিকতা বোঝা যায়।

মেকি সেক্যুলার দলগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের কোন দোষ না দেখা, যেখানে দোষ আছে তাকে চুনকাম করে দেওয়া, ভণ্ডামি করা। এই মানসিকতাকে বিজেপি ঘৃণা করে, বিজেপি মনে করে এর নাম নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ, যার মাধ্যমে দেশের সাম্প্রদায়িকতা জীইয়ে রাখা হচ্ছে। আমি যদি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ হই তাহলে মুসলমানের দোষ দেখব না কেন? একশোবার দেখব, যেমন হিন্দুর দোষও একশোবার দেখব, মুসলমানের গুণও একশোবার দেখব, হিন্দুর গুণও দেখব। এই মেকি সেক্যুলার (সংক্ষেপে মেকিসেকু) চুনকামের বা ভণ্ডামির কিছু নিদর্শন নীচে দেওয়া হল—

(ক) মুসলিম লীগ নামে মুসলিমদের জন্য, কাজেও মুসলিমদের জন্য। এই দলই পাকিস্তান হাসিল করে দেশভাগ করিয়াছিল, তারপর পাকিস্তান থেকে তাবৎ হিন্দু-শিখকে তাড়িয়েছিল। এদিকে বিজেপি চায় সব মানুষের জন্য এক আইন। এই মুসলিম লীগ মেকিসেকুদের চোখে ধর্মনিরপেক্ষ, আর বিজেপি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক।

(খ) জনরোষে বিতর্কিত সৌধ (যাকে মেকিসেকুরা বাবরি মসজিদ বলে) ভেঙেছে, সেজন্য দোষ বিজেপির। কিন্তু বীভৎস উগ্র মুসলিম আফগানিস্তানের তালিবান সরকার কামান দেগে আফগানিস্তানের ব্যামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি যা প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শিল্পকলার একটি অমর নিদর্শন মনে করা হত) উড়িয়ে দিল, ঢাকার রমনা কালীবাড়ি উড়িয়ে দিল। কোন মেকিসেকু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদ করেছে? (যদি মেকিসেকুদের তরফে এর উত্তর হয় ওটা তো বিদেশের ব্যাপার তাহলে বিজেপির প্রশ্ন হবে, তাহলে ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদ কেন করেছিল? আসল কারণ ইরাক মুসলিম দেশ এবং ইরাক নিয়ে লাফালাফি করলে মুসলিম সমর্থন পাওয়া যাবে?)

আমাদের এই শেখার মূলে হচ্ছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেসী ও কম্যুনিস্ট নেতারা, যারা গত প্রায় আশি নব্বই বছর ধরে এই সব মতাদর্শের চাষ করে আসছেন এবং আমাদের শেখাচ্ছেন। তৃণমূলীদের কথা না বলাই ভাল, কারণ তাদের কোন নীতিই নেই। কিন্তু আজকে যদি আমরা পেছনে তাকিয়ে দেখি তা হলে কি দেখব? বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের কি বলবে? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলবে আমাদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। সমাজবাদে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ তো হয়ই না, উল্টে রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে যায় এবং জনসাধারণের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ অত্যাচার, জনসাধারণকে সহ্য করতে হয় দারিদ্র ও বেকারীত্ব। এবার একটু তাকিয়ে দেখি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যে ঠাণ্ডা লড়াই এর যুগ চলেছিল তাতে সারা পৃথিবী দুটি শিবিরে বিন্যস্ত ছিল। এ দুটি হল মার্কিন নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক শিবির এবং সোভিয়েত নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। এই শিবিরদুটি শুধু সামরিক ব্যাপারে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও দুই মেরুর অবস্থানকারী ছিল। বস্তুতঃ ভারত সদৃশ কিছু দেশ, যারা সামরিক দৃষ্টিতে এই দুই শিবিরের কোনটিতেই ছিল না, তাদেরও কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুটি শিবিরের একটিতে অবস্থান নিতে হয়েছিল, এবং সেদিক দিয়ে ভারত মোটামুটিভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরেই ছিল। ধনতান্ত্রিক শিবিরে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের সব দেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড সদৃশ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে (অর্থনৈতিকভাবে) ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস ইত্যাদি এবং পূর্ব ইউরোপের সব দেশ। সঙ্গে ভারতও, একটু 'জলে গোলা' ভাবে।

পুরো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এই দুই ধরনের অর্থনীতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে—সোভিয়েত ইউনিয়নে তো ১৯১৭ সাল থেকে অর্থাৎ তিয়াত্তর বছর ধরে চলেছিল। পরীক্ষার ফল কী দাঁড়াল? দাঁড়াল সংক্ষেপে এই—সোভিয়েত ইউনিয়ন উঠে গেল আর অঙ্গরাজ্যগুলি আলাদা হয়ে গেল। দেশ পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক রাস্তায় চলে গেল। দেশের নাম, পতাকা, সমস্তই বদলে গেল। চীন তার আগেই অর্থনৈতিকভাবে মাও প্রদর্শিত কড়া মার্কসবাদী পথ ছেড়ে দেঙ-এর নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক পথে চলে এল, কিন্তু এক-দল ভিত্তিক কমিউনিস্ট রাজনৈতিক কাঠামো রেখে দিল। আর এই সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ উত্তরোত্তর ধনী হল, তাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নতির সব সীমারেখা ছাড়িয়ে গেল। সবচেয়ে তুলনা করা সহজ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার। এই দুই দেশের মধ্যে মানুষ এক ভাষা, এক ধর্ম, সংস্কৃতি এক, আয়তন ও লোকসংখ্যাও মোটামুটিভাবেএক, আবহাওয়া এক। শুধু উত্তর কোরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক, সরকার নিয়ন্ত্রিত আর দক্ষিণ কোরিয়া ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদে বা বাজার অর্থনীতির পীঠস্থান। আজকে পরিস্থিতি কি? উত্তর কোরিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত, সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশ

হিন্দু হয়ে মমতা যখন মাথায় হিজাব চড়িয়ে নমাজ পড়ার ভান করেন তখন কি তা বেহায়াপনা নয়? মসজিদের ইমাম ও মুয়হিনদের ভাতা পাইয়ে চেবার চেষ্টা করেছিলেন—মহামান্য হাইকোর্ট তা খারিজ করেছেন এই বলে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এটা সম্ভব নয়। এবং এই সব করা তো কোনোক্রমেই সাধারণ মুসলমানদের উপকারের জন্য নয়—তাদের ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের ভোট পাবার জন্য! এই একইভাবে মমতা 'ওবিসি'র দোহাই দিয়ে বকলমে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ চালু করার চেষ্টা করেছেন। এর মানে হচ্ছে যোগ্য হিন্দু, খ্রিস্টান বা শিখ প্রার্থী বঞ্চিত হবে!

(জ) নোংরা জঘন্য দাঙ্গাবাজে মমতার দল ভর্তি। কিন্তু যেহেতু এরা মুসলমান দাঙ্গাবাজ, হিন্দুদের পেটায়, তাই মমতার কাছে এদের মহা আদর। এদের মধ্যে একজন প্রাক্তন বসিরহাটের সাংসদ হাজি নরুল ইসলাম—২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় বিশাল দাঙ্গা বাধিয়েছিল, প্রচুর হিন্দুর সম্পত্তি লুট ও নষ্ট করেছে, হিন্দু মন্দির অপবিত্র করেছে। আর একজন হাসান ইমরান, যাকে মমতা রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে। এ একজন দেশদ্রোহী, বর্তমানে নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংস্থা 'সিমি'-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার নলিয়াখালিতে এ দাঙ্গা লাগিয়ে হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ ও নষ্ট করেছে। মমতা একজন নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক নেত্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন ১৮। মুক্ত বাজার অর্থনীতি বনাম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ গত প্রায় দুই শতক ধরে পৃথিবীতে দুটি অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সমান্তরাল রেখায় চলেছে। একটির পর মুক্ত অর্থনীতি—একে বাজার অর্থনীতি, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ নামেও ডাকা হয়। অন্যটির নাম নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি— এর অন্তর্নিহত তত্ত্বের নাম সমাজবাদ, তার একটি প্রকরণের নাম মার্কসবাদ বা কমিউনিজম। প্রথমটিতে সরকার অর্থনীতি নিয়ে খুব সীমিত পরিমাণে মাথা ঘামায়। বাজারের চাহিদা-জোগানের ভিত্তিতে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থব্যবস্থা তৈরি হয় বলে, এবং মাঝে মাঝে ধ্বংসও হয়। দ্বিতিয়টিতে অর্থনীতি ব্যাপারটা সরকার পুরোপুরি নিজের কব্জায় রাখে, উৎপাদনের সমস্ত শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের জায়গা হয়ে থাকে না, না হলে খুব সীমিত পরিমাণে থাকে। এর মধ্যে মার্কসবাদ বা কমিউনিজম-ভিত্তিকে অর্থনীতিতে একটা বলপ্রয়োগের ব্যাপার আছে, সেজন্য সরকার শুধু অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখে না, মানুষকে ভয় দেখিয়েও বেশি উৎপাদন করবার চেষ্টা করে।

আমরা বাঙালিরা বহুকাল থেকে একটা কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত শিখে এসেছি যে সমাজবাদ একটি উৎকৃষ্ট 'বঢ়িয়া' জিনিস, সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সুনিশ্চিত হয়, বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদে একদল 'শোষক' তারা ফুলে ফেঁপে ধনী হয় তারা জনসংখ্যার বৃহদংশকে 'শোষণ' করে, আর এই 'শোষিত' জনতা উত্তরোত্তর গরীব হতে থাকে, তাদের অবস্থা ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতার হয়।

প্রশ্ন ১৯। তৃণমূলী বা বামপন্থীরা প্রচার করে বিজেপি 'বড়লোকের পার্টি'। এর মধ্যে সত্যটা কতটা?

উত্তর ঃ বিজেপির দর্শনের নাম ধনতন্ত্র নয়, একাত্ম মানববাদ। এই ব্যাপারটা ৮নং প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একথা সত্য যে বিজেপি ব্যবসায় সরকারী মালিকানায় বিশ্বাস করে না—কেন করে না, তা পূর্ববর্তী প্রশ্নেই বিশদ করে বলা হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই সরকারী সংস্থায় বিলগ্নীকরণ হয়েছে। বিজেপি যা বিশ্বাস করে তা ঘোষণা করে এবং রূপায়ণ করে, কংগ্রেস বা সিপিএম-এর মত নাচতে নেমে ঘোমটা টানে না। বিলগ্নীকরণ নিয়ে এই দুই দল যে পরিমাণ ভণ্ডামি করেছে তা কহতব্য নয়। এরা নিজেরা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা বন্ধ করে দিয়ে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইন্ডিয়ান পেপার পাম্প, সুন্দরবন সুগারবিট) কিন্তু বিজেপি বিলগ্নীকরণ করতে গেলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করেছে।

এবার গবীরের স্বার্থরক্ষার কথা। একটা জিনিস সকলের বোঝা প্রয়োজন। তা হল, যে সব দল নিজেদের 'গরীবদরদী', 'গবীরের দল' বলে জাহির করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আছে দারিদ্র্য জীইয়ে রাখার মধ্যে। দারিদ্র্য ঘুচে গেলে তাদের রাজনীতির ভিতরটাই শেষ হয়ে যাবে। সেজন্য এই সব পার্টিরা ততদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন কিছুতেই দারিদ্র্য ঘুচবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—তেমনি অমোঘ সত্য, ভর্তি পেটে মার্কসবাদ হয় না। এই 'গবীরদরদী' রাজনৈতির সবচেয়ে বড়ো পসারী সিপিএম ও লালু যাদব। তাই জ্যোতি বসু ও লালু যাদব নিজেরা বিলাসিতায় ডুবে থাকলেও সাধারণ মানুষকে গরীব রেখে দেবে।

গবীরের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রী কলকারখানা বা বিলগ্নীকরণের কি সম্পর্ক আছে? রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় যারা কাজ করেন তাঁরা কি গরীব? বিলগ্নীকরণ না করলে ভরতুকি দিয়ে শিল্প চালাতে হবে। আর সে ভরতুকির টাকা আসবে গরীব মানুষের পকেট থেকে। তাহলে বিলগ্নীকরণ করলে এত আপত্তি কেন?

এমন নয় যে কমিউনিস্টরা বোঝে না যে তাদের মূলতত্ত্ব ফেল মেরে গেছে, বোঝে না যে সরকারের কাজ নয় ব্যবসা করা। যদি না বুঝত তবে রাষ্ট্রায়ত্ত গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল বিলগ্নীকরণের জন্য বহুজাতিক সংস্থার দোরে দোরে এমন করে ঘুরত না। ঘটনা হচ্ছে, অতি দারিদ্র্যে পড়েও যেমনি সধবা হিন্দু মহিলা কখনো হাতের লোহাটা বিক্রি করতে পারেন না, তেমনি কমিউনিস্টরা সব বুঝেও নিজেদের এঁদোপচা মার্কসবাদ, শ্রেণিসংগ্রাম-মার্কা বিপ্লবীতত্ত্ব ছাড়তে পারে না। সেইজন্যই গরীবের প্রতি দরদ দেখানো আর বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে চিৎকার করা।

প্রশ্ন ২০। আচ্ছা, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন লাভজনক সংস্থা বিক্রি করেছিল? আর হলেও কি সরকার তার জন্য ন্যায্য দাম পেয়েছিল?

উত্তর ঃ যে সংস্থার ক্ষতি হয় সে সংস্থাকে কে কিনবে? সিপিএম এর তো প্রচুর পয়সা আছে, তারা কিনবে? এগুলো আর কিছু নয়, শুধু কিছু অর্থহীন আওয়াজ তোলা, চেঁচাবার জন্য চেঁচানো। সংস্থা বিলগ্নীকৃত হচ্ছে লাভক্ষতির হিসেব থেকে নয়, এই সব ব্যাপারের থেকে সরকারের বেরিয়ে আসা উচিত বলে।

এমন পুষ্টির অভাবে ভুগেছে যে ভাল করে হাঁটতে পারে না। দেশের অর্থনীতি দেউলিয়া, চোরাপথে অস্ত্র চালান রাষ্ট্রের একটি বড় ব্যবসা, সেজন্য উত্তর কোরিয়া পৃথিবীতে অন্যতম পরিচয় rogue state বা অপরাধী রাষ্ট্র হিসাবে। অপরপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে হতে প্রথম বিশ্বে পৌঁছে গেছে, তাদের তৈরি হুনদাই, দেয়ু ইত্যাদি গাড়ি সারা পৃথিবীতে ছোটে, সামসুং, এলজি প্রভৃতি কোম্পানীর তৈরি বৈদ্যুতিক সম্ভার ভারতীয় বাজার ছেয়ে চলেছে। দেশের সাধারণ মানুষও আমাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধ জীবনযাপন করে।

অর্থাৎ পরীক্ষায় মুক্ত বা বাজার অর্থনীতি সসম্মানে পাশ, সমাজবাদী বা নিয়ন্ত্রিত বা সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ডাহা ফেল। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে মুক্ত অর্থনীতি সব মুস্কিলের আসান। এর মধ্যে ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? ভারতের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। আমরাও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্ধ অনুকরণে সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি চালু করেছিলাম, তার পেছনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। নব্বইয়ের দশকের মুখোমুখি এসে দেখা গেল, আমাদের আদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়ন উঠেই গেছে, ভারতেও আর পারা যাচ্ছে না। তখন সব অপমানজনক শর্তে, আমাদের মা-বোনেদের সোনা বন্ধক দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ধার করতে হল। এবং সেই আন্তর্জাতিক চাপে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতির দিকে উত্তরণ শুরু হল তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (পরে প্রধানমন্ত্রী) মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে। এর নাম দেওয়া হল 'অর্থনৈতিক সংস্কার।' কিন্তু অন্যদিক থেকে নানা চাপের ফলে মনমোহন সিং যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে এর রূপায়ণ করতে পারলেন না। তারপর অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এন.ডি. এ সরকার এসে দৃঢ়তার সঙ্গে এর রূপায়ণ করল, কিন্তু নির্বাচনে জিততে পারল না। তারপর এক বিচিত্র অবস্থা হল, বামদলগুলির সমর্থন নিয়ে মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হল। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার—কারণ মনমোহন সিং ও তার অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম পুরোপুরিভাবে বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী, সংস্কারপন্থী, আর তাদের যারা ঠেকো দিয়ে সরকার চালু রেখেছে সেই বামদলরা চায় সেই পুরনো সোভিয়েত তত্ত্বের অর্থনীতিতে ফিরে যেতে। এসবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে একটা খিচুড়ি অর্থনীতির অবতারণা করা হয়েছে—যার গাল ভরা নাম 'মানবিকতাপূর্ণ সংস্কার'। তারপর ২০০৮ সালে তো দুদল আলাদাই হয়ে গেল।

একটা জিনিস কিন্তু দিনের আলোর মত স্পষ্ট। মুক্ত অর্থনীতির যাই দোষ থাকুক, সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি যে চলবে না তা পৃথিবী জুড়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে। এই সত্যটাকে আমরা যদি পুরনো ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মানতে না চাই তা হলে দেশ যে গাড্ডায় আছে সেই গাড্ডাতেই পড়ে থাকবে, সম্ভবত আরও গভীরে ডুবে যাবে। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।

কিন্তু আসার পর মানুষ সবিস্ময়ে দেখলেন, যাঁকে তাঁরা সাদরে মুখ্যমন্ত্রীত্বে বরণ করে এনেছেন তিনি একজন নীতিহীনা, ক্ষমতা লোলুপি, খামখেয়ালী মহিলা। তিনি ক্ষমতায় আসার পর এক চিটফাণ্ডকে মদত দিয়েছেন যারা বহু মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয় লুট করেছে। মুসলিম ভোট পাবার জন্য এই মহিলা যা নির্লজ্জতা দেখিয়েছেন তার তুলনায় নেই—এমনকি বাংলাদেশের হিংস্র জেহাদী মৌলবাদী হিন্দুহন্তা দলের সঙ্গে আপোষ করে তাদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দিয়েছেন এমন মনে করারও কারণ রয়েছে। নিজে থানায় গিয়ে আসামী ছাড়িয়ে এনেছেন। টাকার অভাবে (যার অন্যতম কারণ পূর্বতম বাম সরকারের বেহিসেবী খরচ) সরকারী কর্মীদের মহার্ঘভাতা দিতে পারেন নি, কিন্তু ক্লাবে ক্লাবে অনুদান দিয়ে, চোলাইখোরদের টাকা দিয়ে, চিত্রতারকা ও ক্রিকেটারদের সরকারী খরচে সমাবেশ করে টাকা নয়ছয় করেছেন। অকারণে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে টাকা নষ্ট করেছন। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থ, বেকারী দূরীকরণ ও শিল্পায়নে তিনি ১০০ শতাংশ ব্যর্থ।

আজকের পরিস্থিতি হল, মানুষ তিনটে দলকেই চিনে ফেলেছেন এবং চতুর্থ দল, অর্থাৎ বিজেপি-কে সুযোগ দেবার জন্য মানুষ উদ্‌গ্রীব। মানুষের বিপুল ভোটাধিক্যের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মমতার 'নির্ণায়ক শক্তি' বা 'তৃতীয় দল' হবার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। বিপুল সংখ্যায় অন্য দল থেকে কর্মীরা এসে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। বিজেপির ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গে উজ্জ্বল হলে কমিয়ে বলা হয়—আগামী দিনে মানুষ বিজেপিকেই আশীর্বাদ করে ক্ষমতায় আনবেন।

প্রশ্ন ২২। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পেলে বিজেপি কি করবে? এ বিষয়ে বিজেপি-র পরিকল্পনা কী?

উত্তর ঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যেই বিজেপির স্পষ্ট নীতি আছে। এই নীতিগুলি মানবতার ওপর ভিত্তি করা —আরও বিশেষভাবে বলা যেতে পারে, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রণীত 'একাত্ম মানববাদ' দর্শনের ওপর ভিত্তিকরা। আগেই বলা হয়েছে, একাত্ম মানববাদের চোখে (৮ংং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য) মানুষ অমৃতের সন্তান, মানুষ শুধু অর্থোপার্জনের জন্য জন্মায় না, পার্টির দাসত্ব বা রাষ্ট্রের দাসত্ব করার জন্যও জন্মায় না। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের চোখে মানুষ বাজারে পণ্য, এবং মার্কসবাদের চোখে মানুষ অর্থনৈতিক জীব এবং রাষ্ট্রদাস বা পার্টি দাস—এই দুই মতই বিজেপির কাছে সমান পরিত্যজ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে বিজেপির পরিকল্পনা জানতে হলে প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সমস্যাগুলির অবশ্যই গত সাতাশ বছরের বামশাসন ও কংগ্রেসের ক্লীবতার ফলে সৃষ্ট। এই সমস্যাগুলি কী কী?

১। বেকারী ও বিনিয়োগের অপ্রতুলতা।

২। পরিকাঠামোর অভাব।

৩। স্ফীত, অকর্মণ্য ও জনবিরোধী প্রশাসন-যন্ত্র।

৪। আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবস্থা।

জলের দরে সরকারী সংস্থা বিক্রি করা হচ্ছে—এটি কমডেরদের একটি অত্যন্ত প্রিয় চিৎকার, কিন্তু মার্কসবাদী মিথ্যা। দর জলেরই হোক, আর স্থলেরই হোক, সেটা ঠিক করে দেবে কে? আলিমুদ্দিনের অর্থনীতিবিদ্‌রা? আসলে এটিও একটি ভণ্ডামি, চেঁচাবার জন্যই চেঁচানো। কোন সংস্থার দাম ঠিক করা এত সহজ নয়। কারখানার জমির দাম, বাড়ির দাম আর মেশিনের দান যোগ করলেই কারখানার ন্যায্যমূল্য নির্দিষ্ট হয় না—বাজারে কত ধার আছে তা দেখতে হয়, পাওয়া যা আছে তা পাওয়া যাবে কিনা দেখতে হয়, সংস্থার শেয়ারের দাম দেখতে হয় এবং সর্বোপরি কারখানায় যা উৎপাদন হবে তা বেচে কত লাভ হবে তা দেখতে হয়। এইসব হিসাব আবার এক এক শিল্পপতি এক এক ভাবে করেন। সেইজন্য কারখানা বিক্রির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং স্বচ্ছ পন্থা হচেছ দরপত্র (টেন্ডার বা বিড) চেয়ে উচ্চতম দরপত্র প্রদানকারীকে বিক্রি করা। অরুণ শৌরী, এনডিএ সরকারের বিলগ্নীকরণ মনত্বরী এইভাবেই বিলগ্নীকরণ করেছেন। অরুণ শৌরীর সততা সর্বজনবিদিত, তাতে আজ পর্যন্ত কেউ কালি লাগাতে পারেনি।

প্রশ্ন ২১। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভবিষ্যৎ কি?

উত্তর ঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে, প্রধানতঃ তাঁর সাথে তুলনীয় নেতৃত্বের অভাবে এবং রাজ্যের রাজনীতি সম্পূর্ণভাব কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট এই দুটি মেরুতে আটকে থাকার ফলে বিজেপি বহুকাল রাজ্যে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারেনি। বস্তুতঃ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিজেপি-র প্রান্ত ভোট আধ শতাংশেরও নীচে ছিল। ১৯৯০ সালে ভারত জুড়ে রামমন্দির প্রশ্নে অভূতপূর্ব জনজাগরণের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও হয় এবং বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে একলাফে প্রায় বারো শতাংশের কাছাকছি ভোট পেয়ে যায়। এর কারণ, মানুষ প্রায় তেরো বছরের বামপন্থী শাসনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবং এটাও বুঝেছিলেন যে কংগ্রেস একটা সিপিএম-এর পোষমানা বিরোধী দল পরিণত হয়েছে, এদের দিয়ে আর যাই হোক সিপিএম বিরোধীতা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আশা করেছিলেন এই বিজেপি বোধ হয় পারবে।

ভারতে প্রকৃতপক্ষে সর্বভারতীয় দল দুটোই আছে। বিজেপি ও কংগ্রেস। সিপিআই, সিপিএম নিজেদের যতই আন্তর্জাতিক দল বলুক, সিপিএম আসলে নেহাতই বাঙালী-মালয়ালী পার্টি, সিপিআই হিসেবের মধ্যেই আসে না। আর কংগ্রেস ২০০৪-২০১৪ এই দশ বছরে এমন অপদার্থতার পরিচয় দিয়ে যে তারা আজকে মাত্র ৪৪।

কিন্তু কংগ্রেসের সিপিএম এর সঙ্গে আপোষ-মনস্কতা দেখেই মানুষ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কংগ্রেসকে দিয়ে কোনদিন সিপিএমকে হঠানো যাবে। তাই, ১৯৯৭ সালে যখন মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করলেন এবং সরাসরি সিপিএম বিরোধিতার লাইন নিলেন তখন মানুষের মনে আশার সঞ্চার হল, এবং মানুষ বাবলেন যে এই তৃণমূলই পারবে সিপিএম-কে হঠাতে। সেজন্যই ২০১১ সালে মানুষ তৃণূলকে ঢেলে ভোট দিয়ে জেতালেন এবং মমতা মুখ্যমন্ত্রীত্বে এলেন।

পারে তারা পাবে। কিন্তু ক্লাস ফাইভ থেকে নিচু স্তরের ইংরাজি পড়া আমজনতার ছেলেমেয়েদের কী হবে? এ জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া অন্যান্য শ্রমনিবিড় শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে—যার মধ্যে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং, পর্যটন, নির্মাণশিল্প, প্রভৃতি। কিন্তু জঙ্গীপনার অপবাদ না ঘুচলে কোন শিল্পই আসবে না। সেজন্য পেশাদার বামপন্থী ইউনিয়নবাজদের কোনক্রমেই শ্রমিকদের উস্কানি দিতে দেওয়া হবে না।

পরিকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশাসনের যন্ত্রের স্ফীততা ঃ পরিকাঠামো বলতে বোঝায় রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বাজার, শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ না আসার অন্যতম কারণ এগুলির অভাব পুরো রাজ্যে কলকাতা ছাড়া সব জায়গাতেই এগুলি চরম অপ্রতুল, কলকাতার অবস্থাও আদৌ সন্তোষজনক নয়। এগুলির অভাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে সরকারের দেউলিয়াপনা। এক স্ফীত, অকর্মণ্য প্রশাসন যন্ত্র বামফ্রন্ট সরকার বানিয়েছিল নিজেদের ক্যাডরদের কাজ 'পাইয়ে দেবার জন্য'। এর ফলে পুরো টাকা মাইনে দিতেই খরচ হয়ে যাচ্ছিল, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছুই থাকছিল না। এর সঙ্গে অবশ্যই ছিল প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা ও হাসপাতাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে জঙ্গী ইউনিয়নবাজি।

প্রশাসনের স্ফীততার সঙ্গে সঙ্গে জনবিরোধিতারও প্রশ্ন আসে। দেখা যায় কোঅর্ডিনেশন কমিটি নামক সরকারী ইউনিয়নের প্রশ্রয়ে থেকে একশ্রেণির রাজ্য সরকারী কর্মচারী মানুষকে মানুষ বলেই মনে করতেন না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের মত ব্যবহার করতেন, যখন ইচ্ছা অফিসে আসতেন, যখন ইচ্ছে চলে যেতেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পেনশনের টাকা পেতে এঁদের পেছনে ঘুরে ঘুরে শেষে প্রায় অনাহারে মারা যান, কিন্তু এঁরা নির্বিকার। বাম সরকারের পক্ষে এঁদেরকে কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না—কারণ সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য ভোটে যে কারচুপির দরকার হয় তার জন্য এই সরকার কোঅর্ডিনেশন কমিটির উপর নির্ভিরশীল। মাঝে মাঝে বুদ্ধবাবু 'ডু ইট নাউ' বলে আওয়াজ ছাড়তেন বটে, কিন্তু তা নেহাতই ভণ্ডামি। এসব জনবিরোধিতা বিজেপি সহ্য করবে না। বিজেপি সরকারী কর্মচারীদের এই কথা বোঝাতে উদ্যোগী হবে যে তাঁরা জনসাধারণের সেবক, জনসাধারণের কাজ সুষ্ঠুভাবে, দ্রুতগতিতে করে দেওয়াই তাঁদের কাজ। এজন্য বিজেপি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস—এও হাত দেবে যাতে লালফিতার ফাঁস আলগা হয়, সামান্য একটা সিদ্ধান্ত যাতে অকারণে বহু আমলার কাছে না ঘোরে।

আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ দশা ও রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে দুর্নীতি ও অপরাধচক্র আজ পশ্চিমবঙ্গে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। দমদমের খুনী দুলাল, বালির খুনী বিশ্বজ্যোতি, সল্টলেকের যৌনকর্মালয় মালিক অবতার সিং, উত্তর চব্বিশ পরগণার বুল্টন, শিলিগুড়ির বি ডি সিং, চা বাগানের তারকেশ্বর লোহার, জালিয়াত শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার—এরা সবাই সিপিএম-এর আশ্রয়ে থেকে বজ্জাতি করেছে। তেমনি করেছে তৃণমূলের খুনী অনুব্রত, আরাবুল, মনিরুল। এই বাতাবরণ সৃষ্টি হবার অন্যতম কারণ বিজেপি মনে

৫। গ্রামাঞ্চলে পার্টির অত্যাচারে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ।

৬। পার্টির আশ্রয়ে সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও অপরাধচক্র।

৭। জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন—যার কারণ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও বর্ধিত জন্মহার।

৮। বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও তজ্জনিত সমস্যা।

৯। বাংলাদেশের ঘাঁটি থেকে আই. এস. আই-এর নাশকতামূলক কার্যকলাপ।

এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখতে গেলে একটা মোটা বই হয়ে যায়। এমনকি আমাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টো—যার উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে জনসাধারণকে অবহিত করা—সেটাও একটি বিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় গিয়ে দাঁড়ায়। খুব সংক্ষেপে এই সমস্যাগুলির ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পিত কার্যপ্রণালী নীচে দেওয়া হল।

বেকারী ও বিনিয়োগের অপ্রতুলতা : এই জিনিসটা শুরু হয়েছিল বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির জঙ্গীপনা দিয়ে। এই জঙ্গীপনায় সাধারণ শ্রমিক খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এই ইউনিয়নগুলি বোধ হয় তাদের জন্য স্বর্গরাজ্য এনে দেবে। যখন বুঝলেন তা হবে না, উল্টে কারখানা উঠে যাবে, তাদের চাকরি যাবে হকারি করে বা ভিক্ষা করে খেতে হবে, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সিপিএম পুরোপুরি দুমুখো নীতি চালাচ্ছিল। বুদ্ধবাবু যখন শিল্পপতিদের সভায় যেতেন তখন বলতেন, না না, জঙ্গীপনা একদম বরদাস্ত করা যাবে না। আবার যখন সিটুর সভায় আসতেন তখন বলতেন শ্রমিকের ওপর অত্যাচার সহ্য করা যাবে না, মিটিং মিছিল, বন্‌ধ ঘেরাও যথারীতি চলবে। শিল্পপতিরা এই দুমুখোপনায় হতাশ।

এ ব্যাপারে বিজেপি মনে করে যে জঙ্গীপনা করে শ্রমিকদের সর্বনাশ হয়েছে। পৌষমাস হয়েছে কিছু সিটু ও সিপিএম নেতাদের, যাঁরা বহু কলকারখানায় জমিতে প্রমোটিং করে কোটি কোটি টাকা করেছেন। জঙ্গীপনা যে করা উচিত নয়, সেটা শ্রমিকদের বোঝানো হবে। ফলে তারা স্বেচ্ছায় শ্রমিক মালিক সহযোগিতার রাস্তায় যাবেন, শতাব্দীর পচা শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্বকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলির সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে বিজেপি নিশ্চিত। অপরদিকে শ্রমিক-কল্যাণমূলক যা আইন আছে তাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। এ বাবদে শিল্পপতিদের আইন মানতে বাধ্য করা হবে, এইসব আইন এখনকার মত কেবল লেবার ইন্‌স্‌পেক্টরদের এক অংশের ঘুষ খাবার রাস্তা হয়ে থাকবে না। এর ফলে শিল্পপতিদের মনে আস্থা ফিরে আসবে, এবং তাঁরা যখন দেখাবেন যে বিজেপি বামদের মত দুমুখোপনা করে না তখন তাঁরা বিনিয়োগে মনোযোগী হবেন।

এই বিষয়ে বিজেপি আরও মনে করে, যে শুধু তথ্য প্রযুক্তি শিল্প নিয়ে লাফালাফি করলেই হবে না। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে কারা চাকরি পাবে? শুধু কৃতী ছাত্ররা পাবে, ইঞ্জিনিয়ারিং অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যার গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা পাবে, যারা চোখে মুখে ইংরাজি বলতে

এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না উল্টে যে সামান্য কিছু কলকারখানা এখনো রাজ্যে আছে তারা ধীরে ধীরে গুটিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাবে। সেজন্য এই সরকার ঠিক করেছিল, কিছু করতে না পারি, করবার ভান তো করতে পারি—আর সেই ভান দেখিয়ে বলতে তো পারি যে দেখছ তো ভাই, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি রাজ্যের উন্নতির জন্য। বিনিয়োগ টেনে আনার চেষ্টার জন্য কিছু নম্বরও কি আমাদের দেবে না? এই ভান করার রাজনীতিরই প্রকাশ হল জ্যোতি বসুর প্রতি বছর বিদেশ ভ্রমণ ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও সালিম টাইপের ভাঁওতা ও মমতার সিঙ্গাপুর বেড়ানো। মমতার আমলেও একই খেলা চলেছে—হবে না কেন। উনি যে সিপিএম এর মেধাবী ছাত্রী।

জ্যোতি বসু যে প্রতি বছর বিলেত গিয়ে ফূর্তি করত এবং এক পয়সার বিনিয়োগ আনতে পারেনি তা আজ মানুষের চোখে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব তারপর নতুন লাইন ধরেছিল তথ্যপ্রযুক্তি ও সালিম। এর মধ্যে আরেকজন এসেছিলেন—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে মৌ-দাদা। এর শখ ছিল মুখ্যমন্ত্রী হবার। সে খেলায় বুদ্ধদেব একে টপকে যাবার পর ইনি এখন দিল্লি পালালেন লোকসভার স্পীকার হলেন তারপর দল থেকে বহিস্কৃত হলেন। তারপর বুদ্ধদেব গেলেন। এবার মমতার যাবার পালা।

এই বিষয়ে বিজেপির খুব পরিষ্কার ভাবনা চিন্তা আছে। ত্রিশ বছরের চেষ্টায় সিপিএম যে বেকারবাহিনী তৈরি করেছে তাদের সকলকে চাকরি দেবার যাদুদণ্ড অবশ্যই বিজেপির হাতে নেই। কিন্তু বিজেপির মাথার মধ্যে বেকারদের নিয়ে চিন্তা আছে, ভণ্ডামি নেই। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির কথা বিজেপি ভেবে রেখেছে।

(ক) কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জায়গা অত্যন্ত সীমিত—বস্তুতঃ জাতির বা রাজ্যের উন্নতি তখনই হবে যখন কৃষিক্ষেত্র থেকে মানুষ ধীরে ধীরে শিল্প বা পরিষেবার ক্ষেত্রে চলে আসবে। কিন্তু কৃষিভিত্তিক শিল্প, যেমন আলুর হিমঘর, আলু থেকে চিপস্ টমেটো থেকে কেচাপ্ বা টমেটো সস্, লঙ্কা ও লেবু থেকে আচার গড়ে তোলার ব্যবসা সৃষ্টি করতে হবে—যার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নাগরিক সুবিধা। এইসব বিষয়ে বিজেপি জোর দেবে।

(গ) শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্যও চাই ওই তিন উপাদান—অর্থাৎ পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নাগরিক সুবিধা। এর সঙ্গে প্রয়োজন সরকারি কর্মযন্ত্রের সহযোগিতা—সিপিএম ও কোঅর্ডিনেশন কমিটির কবলে পড়ে যা আজ প্রায় শূন্যে ঠেকেছে।

(ঘ) পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আজ সবচেয়ে বেশি। এর জন্যও এই তিন উপাদান তো চাইই। সেই সঙ্গে চাই ইংরেজি জানা বিশাল কর্মদক্ষ বাহিনী। শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিচারিতা চালিয়ে সিপিএম এবং নৈরাজ্য চালিয়ে তৃণমূল যেভাবে যুবসমাজের সর্বনাশ করেছে বিজেপি তাকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে বদলে দেবে।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের সম্বন্ধে যে মারমুখো ভাবমূর্তি বামদলগুলি ভারত

করে, পার্টি রাজনীতিকে একেবারে ব্যক্তিপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যার ফলে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। এর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপের বিষয়টিও জড়িত। গ্রামপঞ্চায়েত এবং গ্রামসভা পর্যন্ত পার্টির প্রতীকে নির্বাচন করিয়ে সিপিএম পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে এমন একটা অসুস্থ সমাজ সৃষ্টি করেছে বা করতে চাইছে সেখানে পার্টিকে জিজ্ঞাসা না করে মানুষ আহার নিদ্রা মৈথুনও নিজের ইচ্ছায় করতে পারবে না। ধান কাটাতে কাকে লাগবে, ট্রাক্টর কার কাছ থেকে ভাড়া নেবে, ভাড়া কত হবে, জমি কাকে বিক্রি করবে, মেয়ের বিয়ে কোথায় দেবে, ছেলে কি পড়বে—এ ব্যাপারে মানুষের নিজের কোন মতামত থাকবে না। সবই ঠিক করে দেবে সর্বশক্তিমান 'পার্টি' বা 'লোকাল কমিটি'? এরা তো কিছু নীচুস্তরের চালাকি সম্পন্ন কুচক্রী ক্ষমতার মদে মাতাল সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি অমৃতের সন্তান, কেন আমি এসব কুচক্রী লোকের কথায় চলব? কিন্তু চলতে হচ্ছে এবং তারই ফলে জন্ম নিচ্ছে দুলাল, বিশ্বজ্যোতি, বুল্টন।

এই অবস্থার অবসান ঘটাতে, বিজেপি মনে করে মানুষের জীবনে রাজনীতির জায়গা ছোট করে আনতে হবে। পুলিশের ইউনিয়ন করা উচিত কি উচিত নয় সে প্রশ্ন তো আগেই তোলা হয়েছে। বিজেপি জীবনের সর্বস্তরে রাজনীতি ঢোকানোকে সমাজের বিকৃতি বলে মনে করে, ব্যক্তি মানুষের ওপর পার্টির প্রভুত্ব কায়েম করার যে চেষ্টা এক বিজেপি ঘৃণা করে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি হবে। পুলিশ অপরাধী ধরবে, শাসক পার্টির প্রশ্রয়ে কেউ আছে বলে তাকে ছেড়ে দেবে না। মানুষের জীবনের সর্বস্তরের রাজনীতি ঢুকতে দেওয়া হবে না। মাঠে চাষ হবে, স্কুল কলেজে শিক্ষা হবে, সরকারী দপ্তরে জনসাধারণের (পার্টির নয়) কাজ হবে, কারখানায় উৎপাদন হবে, পঞ্চায়েত ও পুরসভার জনকল্যাণমূলক কাজ হবে, হাঁসমুরগীর খোঁয়াড়ে হাঁসমুরগী পালন হবে। রাজনীতি শুধু বিধানসভা ও লোকসভায় হবে।

প্রশ্ন ২৩। পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সম্বন্ধে ও সে ব্যাপারে বিজেপির চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখলে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহতম সমস্যা হল বেকার সমস্যা। এই রাজ্য আর সব বিষয়ে আজ ভারতের মধ্যে শেষের সারিতে হলেও বেকারের সংখ্যায় সগৌরবে প্রথম। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা এই রাজ্যে এক কোটির কাছাকাছি। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থেকে নথিভুক্তি বেকারদের ডেকে বলে দেওয়া হয়েছে, এখানে আর আসবেন না, দশ বছরের মধ্যে চাকরি হবার কোন সম্ভাবনা নেই, বরঞ্চ শেয়ার মার্কেটে গিয়ে ফাটকা খেলুন। আজকে দেশের যুবশক্তি,ত অর্থাৎ যারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বি.এস.সি.বি.কম পাশ করে জগতে পদার্পণ করছে তাদের সামনে বিরাজ করছে এক নিশ্চিত অন্ধকার—যাকে প্রকাশ করা যেতে পারে তিনটি শব্দ দিয়ে, বেকারী, হকারী এবং ভিখারী।

এ ব্যাপারে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর দুশ্চিন্তা ছিল। তারা জানত তারা কোনদিনই

প্রশ্ন ২৫। তৃণমূল ও সিপিএম রটায় বিজেপি 'মাড়োয়ারিদের পার্টি, হিন্দীভাষীদের পার্টি। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এটা নোংরা প্রাদেশিকতা ছাড়া কিছু নয়। তৃণমূলের সখ হয়েছিল সর্বভারতীয় পার্টি হবার—সেজন্য পার্টির নামে একটা 'অল-ইন্ডিয়া' লাগিয়েছেন।

দিল্লীতে আন্না হাজারেকে নিয়ে একটা সভা করতে চেষ্টা করেছিলেন। আন্না আসেননি, সভা চরম ফ্লপ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যত প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন প্রায় সবারই জামানত জব্দ হয়েছে। আর সিপিএম? পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা ছাড়া আর কোথাও তো এদের অস্তিত্বই নেই! এরা প্রাদেশিকতা করবে না তো কে করবে?

প্রশ্ন ২৬। মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ চালাচ্ছে (বা চালাবার চেষ্টা করছে) সে বিষয়ে বিজেপির মতামত কি?

উত্তর ঃ যখন পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোটকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে সরকারে এনেছিলেন তখন তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটিই ঃ যে-কোনো মূল্যে এই নষ্ট সরকার, এই শয়তান সরকার, এই কুচক্রী বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে হবে, এদের চেয়ে খাবার কেউ হতে পারে না। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই সময় বহু বিজেপি সমর্থকও বিজেপিকে ভোট না দিয়ে তৃণমূলকে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে বিজেপিকে ভোট দিলে বামবিরোধী ভোট বিভাজিত হয়ে যাবে, সিপিআই (এম) জিতে যাবে সেই সময় আমরা বলেছিলাম, 'রঘু ডাকাতকে তাড়িয়ে কালু ডাকাতকে ডেকে আনবেন না।' কিন্তু মানুষ আমাদের কথা শোনেননি, শয়তান সিপিআই (এম) কে বিদায় দেবার তাগিদে ঢেলে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন।

এখন (যখন এই লেখা হচ্ছে তখন মমতা ব্যানার্জী সরকারের সাড়ে ছয় বছর অতিক্রান্ত) কি দেখা যাচ্ছে? সংক্ষেপে মমতা সরকারের নিম্নলিখিত চেহারাটি মানুষের চোখের সামনে উঠে আসছে ঃ

(ক) পুলিশে দলীয় নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলার ক্রমাবনতি।

(খ) সম্পূর্ণ নীতিহীন সরকার যা চলে মমতা ব্যানার্জীর খামখেয়ালিপনার উপর ভর করে।

(গ) বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং রাজ্যের শিল্পায়নে ব্যর্থতা।

(ঘ) বন্ধ্যা জমিনীতি ও পরিকাঠামো উন্নয়ন স্তব্ধ।

(ঙ) নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ।

(চ) নারীর অবমাননা।

(ছ) মৌলবাদী শক্তিকে মদতদান ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী যোগ।

(জ) চিটফান্ড গোছের প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ।

এর প্রত্যেকটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

জুড়ে তৈরি করে দিয়েছে তাতে শ্রমিকদের সর্বনাশ হয়েছে, লাভ হয়েছে শুধু বাম ইউনিয়নবাজ দাদাদের। এই মারমুখো ভাবমূর্তি যে কোন মূল্যে বদল করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে যে রকম কর্মবিমুখতার সংস্কৃতি, দিচ্ছি না দেব না, দিতে হবে মানতে হবে, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও এর সংস্কৃতি, মিছিল বন্‌ধের সংস্কৃতি, সিপিএম ও বামদলগুলি পশ্চিমবঙ্গে কায়েম করেছে তাকে সমূলে উৎখাত করে শ্রমিক মালিক সমঝোতার সংস্কৃতি বিজেপি নিয়ে আসবে।

(চ) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বদনামের মূলে রয়েছে মার্কসবাদ লেনিনবাদ নামক এক পুরনো, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত, মানবতাবিরোধী তত্ত্বে মানুষের বিশ্বাস। এই তত্ত্বকে বাকি পৃথিবী ইতিহাসের আস্থাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—বাঙালি যদি নিজের ভাল চায় তবে বাঙালিকেও তাইই করতে হবে।

(ছ) পরিষ্কার জমিনীতি প্রণয়ন করা হবে। মমতার খামখেয়াল ও তৃণমূলের নৈরাজ্য বন্ধ হবে।

প্রশ্ন ২৪। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে মমতা যে আন্দোলন করেছিলেন সেটা সম্বন্ধে বিজেপির মনোভাব কি?

উত্তর ঃ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে যখন মমতার আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন বিজেপি-তৃণমূল জোটবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ সে সময় বিজেপি সাহায্য না করলে আজকে মমতা হয়তো থাকতেনই না। দুটো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। নন্দীগ্রামে যখন সিপিএম-এর ক্যাডাররা পুলিশের উর্দি পরে নিঃসহায় শিশু-মহিলা সমেত মানুষের ওপর গুলি চালাল তখন তার প্রতিবাদে বিজেপি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়েছিল। ঝাঁপিয়েছিলেন মমতাও কিন্তু সিপিএম তাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতেই দিচ্ছিল না, এবং মমতার সাধ্য ছিল না জোর করে ঢোকেন। সেই সময় আদবানিজী এবং সুষমা স্বরাজ নন্দীগ্রামে গেলেন—এঁদের আটকাবার সাধ্য আবার সিপিএম-এর ছিল না, এবং তারই পিছন পিছন মমতা নন্দীগ্রামে ঢুকলেন এবং আন্দোলন সংগঠিত কররেন। আজকে যখন মমতা বলেন তিনি নন্দীগ্রামের আন্দোলন একলা করেছেন, কেউ সাহায্য করেনি, তখন হাসি পায়।

এছাড়া, মমতা যখন এসপ্ল্যানেডে অনশন আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি একটা অন্ধগলিতে ঢুকে পড়েছেন, সম্মানজনকভাবে অনশন থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছেন না। সিপিএম তাঁকে নিয়ে হাসি তামাশা করছে, আর অপেক্ষা করছে কখন তিনি রণে ভঙ্গ দেন। এই সময়ে বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং কলকাতায় এসে মমতাকে অনশন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেছিলেন এবং বিষয়টি নিয়ে সংসদে বিজেপি সোচ্চার হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কিন্তু নিশ্চুপ, নির্বাক। সনিয়া বা মনমোহন কখনো এ নিয়ে কখনো কোনো মন্তব্য করেন নি। রাজনাথ সিং -এর আসার সুযোগ নিয়েই মমতা সম্মান বাঁচিয়ে অনশন প্রত্যাহার করলেন।

তুলব না। কোন শিল্পপতিকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে যে তিনি এই সব আবদার মেনে পশ্চিমবঙ্গে আসবেন? অতএব শিল্প হবে না, এবং বেকারের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

(ঘ) মমতার বন্ধ্যা জমিনীতির কথা আগেই বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ নেতিবাচক নীতি, যা শিল্পপতিদের চরম নিরুৎসাহ করে দেয়। শিল্পপতি টানবার জন্য মমতা কিছু লোক দেখানো আয়োজন করেছেন—এইসব তামাশা দেখে বা মমতার লেকচার শুনে শিল্পপতিরা হাততালি দেবেন কিন্তু একপয়সা বিনিয়োগ করবেন না। পরিকাঠামোর সর্বনাশ জ্যোতি বসু করেছিলেন সময়মত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন না করে, যার ফলে সত্তর ও আশির দশকে রাজ্য অসম্ভব বিদ্যুৎ সঙ্কটে ভুগেছিল। এখন বিদ্যুতের কোন অভাব নেই, কারণ বিদ্যুৎ নেবে এমন কারখানাই নেই। কিন্তু এখন অভাব হচ্ছে নাগরিক পরিকাঠামোর—অর্থাৎ রাস্তাঘাট, জল, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিনোদনের জায়গা ইত্যাদির। এই জন্য যখন মমতা বলেন পুরুলিয়ার গিয়ে শিল্প করুন, কেউ তাঁর কথা শোনে না। আসলে এসব নিয়ে এঁর কোন চিন্তা নেই, চিন্তা করবার ক্ষমতাও নেই—শুধু বলবার জন্যই বলেন।

(ঙ) মমতার নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ এমন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে সংখ্যালঘু মানুষ পর্যন্ত এর ধোঁকা ঘরে ফেলেছেন। মুসলিম মেয়েদের অনেকে হিজাব পরেন, মুসলিমরা নমাজ পড়েন—এটাই ওঁদের উপাসনা পদ্ধতি। কিন্তু মমতা তো মুসলিম নন উনি কেন হিজাব পরলেন বা নমাজের ভান করতে গেলেন? এটা কোনো দেশী ভণ্ডামি? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তহবিল থেকে মমতা মসজিদের ইমামদের ভাতা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, মহামান্য হাইকোর্ট তা খারিজ করে দিয়েছেন। কেন চেষ্টা করেছিলেন? আসলে মমতার ছক হচ্ছে, 'সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বৃহদংশ তো আমাদের ভোট দেবেই, আর এর সঙ্গে যদি ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট মেলাতে পারি তা হলে অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকা যায়।

'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস যে ধরণের নোংরামি করে বেড়ায় তার ফল বিষময় হতে বাধ্য। একটি ফল তো দাঙ্গা! তৃণমূলের দুই এমপি হাজি নুরুল ইসলাম এবং হাসান ইমরান যথাক্রমে ২০১০ সালে উঃ ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় এবং ২০১৩ সালে দঃ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার নলিয়াখালিতে যে দাঙ্গা লাগিয়েছিল তাতে বহু হিন্দুর বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। অথচ এই দুই শয়তানের পার্টি উঠতে বসতে বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ বলে গালাগালি করে। চোরের মায়ের বড় গলা। এবং আশ্চর্য, কলকাতার সংবাদমাধ্যম এই দুই তৃণমূল সাংসদের কূকীর্তির কথা বেমালুম চেপে গেছে।

আজকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বোঝার সময় এসেছে যে কোনো সম্প্রদায়কে তোষণ করলে শুধু অন্য সম্প্রদায় নয়, সেই সম্প্রদায়েরও ক্ষতি হয়, কারণ সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়, যা কারুর পক্ষেই মঙ্গলকর হতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে সব সম্প্রদায়কে সমান চোখে দেখা। কারুক প্রতি ভোটের লোভে পক্ষপাত না করা।

(ক) পুলিশে দলীয় নিয়ন্ত্রণের সম্ভবত সেই সময় শুরু যখন মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে ভবানীপুর থানায় নিজে গিয়ে আসামী ছাড়িয়ে এনেছিলেন। তারপর এল পার্ক স্ট্রীটের ধর্ষণ ঘটনা যেখানে মমতা পরিচালনকারী পুলিশ অফিসারকে বদলি করে দিলেন এবং ঘটনা সম্বন্ধে বললেন 'সাজানো ঘটনা'। এর থেকে পুলিশের কাছে পরিষ্কার বার্তা গেল যে এই মামলা নিয়ে বেশি হৈ চৈ করা চলবে না—এবং আজ পর্যন্ত এর মূল অভিযুক্ত কাদির ধরা পড়েনি। তারপরে কাটোয়ায় এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণ এবং মালদায় এক মহিলাকে ধর্ষণ করে তার বাবার চোখে রড ঢুকিয়ে দেবার ঘটনায় এরই পুনরাবৃত্তি হল। তৃণমূলের 'উদ্যমী ছেলে' ক্লাস এইট পাশ আরাবুল কলেজ শিক্ষিকাকে জগ ছুঁড়ে মেরেছে, মনিরুল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে পায়ের তল দিয়ে তিনটে লোককে মেরে দিয়েছে, অনুব্রত প্রকাশ্যে পুলিশকে বোম মারার কথা বলেছে, সুদীপ্ত থানার ভিতরে ঢুকে পুলিশকে পিটিয়ে গেছে—এর পরে পুলিশের আর অস্তিত্ব থাকে, না মনোবল থাকে? বীরভূম জেলা তো প্রায় মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে—পাড়ুই থানার চৌমণ্ডলপুর গ্রামে তৃণমূলের ঘাতকবাহিনী ঢুকে তৌসিফ নামক একটি আঠেরো বছরের ছেলেকে খুন করে ছিল। এসব ব্যাপারে পুলিশের কোন হেলদোল নেই—কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল অধিষ্ঠিত উপাচার্যের কথায় পুলিশ এসে নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে দিল। এসব থেকেই বোঝা যায় আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা কোন তলানিতে এসে ঠেকেছে। সিপিআই (এম) ও একই জিনিস করত—কিন্তু তার মেধাবী ছাত্রী মমতা গুরুকেও ছাপিয়ে গেছেন।

(খ) তৃণমূলকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাদের কৃষিনীতি কি, শিল্পনীতি কি, অর্থনৈতিক বিষয়ে, অর্থাৎ সরকারী মালিকানা বনাম বেসকারীকরণের প্রশ্নে তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে—তারা আমতা-আমতা করবে, জবাব দিতে পারবে না। কারণ এই দলটির কোন নীতি নেই—মমতা ব্যানার্জীর সাময়িক খামখেয়ালই এদের নীতি। সিপিআই (এম)-এর নীতি সম্পূর্ণ ভুল ও দুষ্ট নীতি কিন্তু তবু সেটা একটা নীতি, খামখেয়াল নয়। কংগ্রেসেরও তাই। কিন্তু তৃণমূলের ত্রিফলা বাতি সাজানা, সবজায়গায় নীল সাদা রং করা এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় বা চিত্র তারকা জোগাড় করে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর তাদের সঙ্গে নাচন-কোঁদন চরম খামখেয়ালিপনা ও নীতিহীনতারই পরিচয় দেয়।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা বিশাল বেকার সমস্যা—যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই সমস্যার সিংহভাগই সিপিএম-এর দয়ায় হয়েছে—জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন করে, কারখানায় ম্যানেজার পিটিয়ে, শ্রমিকদের বিপথে চালিয়ে তাদের কারখানা তুলে দিয়েছেন, তাদের পথের ভিখারী করেছেন। সিপিএম-এর মেধাবী ছাত্রী মমতার আমলেও এর কোন পরিবর্তন ঘটে নি—অল্প কিছুদিন আগেও হুগলী জেলার একটি জুটমিলে পিটুনিতে এক ম্যানেজারের মৃত্যু হয়েছে। মমতার সিঙ্গুরে হঠকারী আন্দোলন এবং ফলে টাটা মোটরস-এর রাজ্য থেকে প্রস্থানও একটি মারাত্মক পদক্ষেপ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাম আমলের পরিকাঠামোর অভাব ও মমতার জমি নিয়ে গোঁয়ারতুমি। জমি অধিগ্রহণ—করব না; সে—হতে দেব না; জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন

প্রশ্ন ২৭। মমতা ব্যানার্জীর গত সাত বছরের (২০১১ সাল থেকে) রাজত্বকাল সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ এই কলুষিত বছরগুলির সম্বন্ধে বলতে গেলে কোথা থেকে আরম্ভ করতে তাই বলা মুস্কিল। তা হলেও মোটামুটিভাবে এই মহিলার রাজত্বের কুকীর্তিগুলি মানুষের সামনে রাখছি। প্রথমে এই কুকীর্তির একটা তালিকা করে দিই, তারপর তার ব্যাখ্যা করব।

মমতা ব্যানার্জীর কুকীর্তির তালিকা

১। সিপিএম রাজত্বকালে যে কুকীর্তিগুলি তারা কায়েম করেছিল সেগুলির অন্ধ অনুসরণ।

২। পুলিশ ও প্রশাসনে সিপিএম স্টাইলের দলবাজী ও পক্ষপাতিত্ব।

৩। রাজ্য জুড়ে অরাজকতা দুর্নীতি সন্ত্রাস ও তৃণমূলের অন্তর্দলীয় লড়াই।

৪। নোংরা ধরণের সংখ্যালঘু তোয়াজ ও সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা।

৫। রাজ্যে শিল্পবাণিজ্য না আসা এবং প্রচণ্ড বেকার সমস্যা এ তজ্জনিত অপরাধপ্রবণতা।

৬। রাজ্য জুড়ে অব্যবস্থা, সেতু ধসে পড়া, শিক্ষায় অরাজকতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা বানচাল।

৭। সারা রাজ্যে এক জঘন্য চাটুকারিতার বাতাবরণ কায়েম।

৮। রাজ্যের প্রতি নজর না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হবার দিবাস্বপ্নে দেশ জুড়ে নেচে বেড়ানো এবং দেদার টাকা খরচ।

৯। তৃণমূলীদের প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য।

১০। দেশের স্বার্থ, রাজ্যের স্বার্থ ভুলে রোহিঙ্গিয়া সমস্যা, অসমের এন. আর.সি ইত্যাদি বিষয়ে নাগ গলানো ও অনধিকার চর্চা।

মনে রাখতে হবে, এগুলি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এবার এর একটু বাখ্যা প্রয়োজন।

সিপিএম জানত, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে শুধু জনসমর্থনের জোরে তারা তা পারবে না, অতএব অন্য উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে। সেই উপায় সিপিএম-এর কাছে ছিল প্রচণ্ড দমননীতি, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এবং প্রয়োজনে না হোক খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি করা। এগুলো যে তৃণমূল নকল করছে না তা নয়—দমননীতি তো করছেই, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন এগুলি বলে বলে করছে, যেমন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মমতার লোপ এক নম্বর জলহস্তী আস্ফালন। অথবা তাপস পালের উক্তি, 'ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করিয়ে দেব।' তফাৎ কেবল এই যে সিপিএম এর যেরকম সাংগাঠনিক বাঁধুনি ছিল তৃণমূলের তার ধারেকাছেও নেই। পুরোপুরি এক অরাজক পাটি। তাই সিপিএম যেরকম নিঃশব্দে ও পৈশাচিক ভাবে নির্যাতন চালাত তৃণমূল তা পারছে না, সবই মানুষের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

পুলিশ-প্রশাসনে দলবাজীর ব্যাপারে কিন্তু তৃণমূল গুরুমারা চেলা, সিপিএমকে

(চ) পশ্চিমবঙ্গে নারীর সম্মান আছে এমন গর্ব একসময় মানুষের ছিল—সে গর্ব আজ ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। পার্কস্ট্রীট ধর্ষণ, কাটোয়ার ছোট রেলে ধর্ষণ, কামদুনির ধর্ষণ ও বীভৎস হত্যা, মালদার সুজাপুরে এবং ইংলিশবাজারে ধর্ষণের ঘটনা—এরকম আরো বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে দুঃখ জনক ঘটনা হচ্ছে, এই ধর্ষণের ঘটনাগুলির যাতে যথাযথ তদন্ত না হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর স্তর থেকে পর্যন্ত নানারকম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—যেমন সাজানো ঘটনা, তুচ্ছ ঘটনা ইত্যাদি। ভাল পুলিশ অফিসারদের বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক, তৃণমূলের এমপি দাদা তাপস পাল ভয় দেখিয়েছেন, ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করিয়ে দেব'। আর কি বাকি রইল?

(ছ) মৌলবাদী শক্তিকে মদতদান এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী যোগ—যা তৃণমূলের ক্ষেত্রে ঘটেছে তা সর্বসমক্ষে এসেছে বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরে, কিন্তু তলায় তলায় অনেকদিন থেকেই ঘটছিল। এর সঙ্গে সারদার টাকারও যোগ আছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা হচ্ছে থাকে বলে 'তুমি আমার পিঠ চুলকে দাও, আমিও তোমার পিঠ চুলকে দেব।' এক্ষেত্রে 'তুমি হচ্ছে বাংলাদেশী মৌলবাদী শক্তি—যার মধ্যে জামাতে ইসলামী, জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ ইত্যাদি অনেকেই আছে। এদের বাংলাদেশে ঠাঁই নেই কারণ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এরা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। এখন শেখ হাসিনার সরকার এদের খপাখপ ধরছে আর জেলে ভরছে। 'আমি হচ্ছে তৃণমূল। আমি তোমাকে পশ্চিমবঙ্গে বোমা তৈরি করার জন্য খাগড়াগড় সদৃশ জায়গা দেব—তুমি এখানে মৌলবাদী প্রচার করে আমাকে মুসলিম ভোট পাইয়ে দেবে এটাই চুক্তি।

(জ) চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারি—যেমন সারদা বা রোজভ্যালি ইত্যাদির কথা আমরা সবাই জানি। কত গ্রামের কত গরীব মানুষে সারা জীবনের সঞ্চয় এরা মেরে দিয়েছে তাও জানি। অথচ প্রথম যখন এরা ধরা পড়ল মমতা কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'যা গেছে তা গেছে'। এর চাইতে হৃদয়হীন কথা কমই শোনা গেছে।

সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারি শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়, বিহার, আসাম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাতেও ছড়িয়ে আছে। এই সব রাজ্য সরকারেরা চেয়েছি এর তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা করুক। কিন্তু মমতা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে গিয়েছিলেন যাতে এটা তাঁর পুলিশের কাছে থাকে এবং এজন্য উকিলের ফী দিতে বহু কোটি টাকা খরচ করেছেন। কেন? আজকে পর্যন্ত (নভেম্বর ২০১৪) তৃণমূলের তিন তাবড় নেতা, যেমন কুণাল ঘোষ, রজত মজুমদার ও সৃঞ্জয় বোসকে হাজতে পোরা হয়েছে, মদন মিত্র ও শুভ্রাপ্রসন্নকে তদন্তের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। ভয়ের চোটে মদন মিত্র এ- হাসপাতাল, সে হাসপাতাল করে বেড়াচ্ছে। সুদীপ্ত সেন যে বহু কোটি টাকা দিয়ে মমতার ছবি কিনেছেন তা আজকে পরিষ্কার। ডেলো পাহাড়ে কি হয়েছিল তা এখনো রহস্যাবৃত। কিন্তু আস্তে আস্তে সবই প্রকাশ পাবে।

বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিক্রিয়া—যাকে ইংরাজিতে বলে 'ব্যাকল্যাশ' আরম্ভ হয় তবে তো মমতা মুখ থুবড়ে পড়বে! তাই রোজ দুবেলা বিজেপিকে গালাগালি।

মাঝেরহাট-পোস্তা-ফাঁসিদেওয়ার সেতু ধসে পড়া, বাগড়ি মার্কেটে বিধ্বংসী আগুনের কথা সবাই জানে। কিন্তু এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সম্রাজ্ঞী মমতা কি করছেন? অতীতে এক রোম সম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, তার নাম নীরো—তিনি নগরীতে আগুন লাগিয়ে বেহালা বাজাতেন। মমতাও তাই করছেন—জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নকল করে শিল্পপতি ধরে আনার নাম করে বিদেশে গিয়ে স্ফূর্তি করছেন, স্বদেশের টাকা ওড়াচ্ছেন।

আজকে পশ্চিমবঙ্গে যেমন এক চাটুকারিতার আবহাওয়া পরিব্যপ্ত সেরকম কস্মিনকালেও বাঙালি দেখেনি। যা হচ্ছে সবই 'মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায়! রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের বান ডেকেছে, যুবসম্প্রদায়ের প্রত্যেকে দুটো-তিনটে করে চাকরি পাচ্ছে, হাসপাতালগুলি ঝকমকে, তকতকে, কৃষকের গরু হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গরু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—সবই মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায়। যিনি বহু বছর কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছিলেন তিনি হঠাৎ আরাম পাচ্ছেন। এই চাটুকারিতার সামিল হয়েছে কলকাতার কিছু সাংবাদিক, যারা এর ফায়দা পুরোমাত্রায় ওঠাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী হবার খোয়াব দেখা এখন মমতার মজ্জায় মজ্জায় করুণানিধি মারা গেলেন সুদূর তামিলনাড়ুতে—দৌড়ে গেলেন মমতা, রইলেন চোলা হোটেলে, যার দৈনিক ভাড়াই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। বুঝুন ব্যাপার—দৈনিক ভাড়া, এদিকে কিন্তু পায়ে হাওয়াই চটির গরীবী ভড়ং ঠিকই আছে।

ব্যর্থতার তালিকা

১। কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঃ-

এই রাজ্যের প্রায় ৪১ শতাংশ পরিবার হয় ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী পরিবার অথবা নথীভুক্ত বর্গাদার পরিবার। এই রাজ্যে কৃষির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং রেকর্ডেড বর্গাদারদের হাতে আছে। এই অংশ মূলতঃ দারিদ্রের কারনে, আধুনিক কৃষির ঝুঁকি গ্রহণ করতে ভয় পান এবং চিরাচরিত পদ্ধতির চাষে আবদ্ধ আছেন। কিছু গালভরা প্রতিশ্রুতি ছাড়া বর্তমান রাজ্য-সরকার কৃষকদের বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থরক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার বিভিন্ন দিকগুলি হল -

ক) কৃষি উপকরণ যেমন সার, বীজ, পরামর্শ সহ যন্ত্রাদির অপ্রতুলতা, প্রশিক্ষণ, ঋণ বীমা'র অভাব, অভাবী বিক্রি প্রভৃতি কারণে চাষ থেকে যথেষ্ট লাভ হচ্ছে না। বীজের প্রশ্নে এই রাজ্যে এখানো অন্য রাজ্য বিশেষতঃ পাঞ্জাবের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

খ) ধান চাষের উপর অত্যাধিক ঝোঁক, পাশাপাশি অর্থনৈতিক লাভজনক ফসল, ফল, ফুল প্রভৃতি চাষ সম্পর্কে সচেতনতা ও সহায়ক ব্যবস্থাপনা'র অভাব, কৃষকের লাভের পথে বড় অন্তরায়।

ছাড়িয়ে এককাঠি এগিয়ে গেছে। সিপিএম নিজেদের ক্যাডার দিয়ে খুনজখম করাত, পুলিশ চুপচাপ বসে দেখত, কেস নিত না। তৃণমূলের ক্যাডাররা কেউ কারুক কথা শোনে না। তাই দিদি নতুন পন্থা বের করেছেন—কেস খাওয়ানো। পুলিশকে বলা হচ্ছে একে এই ধারা, তাকে সেই ধারার কেস দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে দিন। থানায় যে তৃণমূলের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধেই কেস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মমতার পোষা এক নম্বর জলহস্তী তো প্রকাশেই বলেছে, অমুকের নামে গাঁজা কেস দিয়ে দে। উল্লেখ গাঁজা কেস। অর্থাৎ এন ডি পি এস আইনে কেস হলে ছয় মাস জামিন হয় না।

রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি অরাজকতা ও সন্ত্রাস এবং তৃণমূলের অন্তর্দলীয় খেয়োখেয়ি তো আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। দুর্নীতির আরম্ভ দিদি এবং তাঁর পরিবাবর্গকে দিয়েই। আবোলতাবোল কাগাবগা মার্কা ছবি এঁকে দিদি সেটা এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন—করেছেন সুদীপ্ত সেনকে। কেউ বিশ্বাস করবে যে এই কাবাবগা ছবির এত দাম হতে পারে? এবার 'পিসিমণির আদবের ভাইপোর দিকে তাকান। তিনি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যে এফিডেভিট বা হলফনামা দাখিল করেছিলেন তাতে নিজের আর লিখেছেন বছরে চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। কে তাঁকে চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দিল? না লিখেছেন, তিনি 'কনসালটেন্সী' অর্থাৎ মানুষকে পরমর্শদান করে এই টাকা উপায় করেছেন। বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর, কোনো বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। একটা ডিগ্রি আছে দিল্লীর IIMP নামক একটা ইনস্‌টিটিউট থেকে, যাদের ডিগ্রি দেবার অধিকার দিল্লী হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। এবার চুয়াল্লিশ লক্ষের রহস্য বুঝুন।

অরাজকতা ও তৃণমূলের অন্তর্দলীয় খেয়োখেয়ি বীভৎস আকার ধারণ করেছে। এর আরম্ভ হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে, এখন সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বীরভূম জেলায় ময়ুরাক্ষী নদীর বালি তোলা নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। ময়ূরাক্ষীতে জল নেই। কিন্তু জলহস্তী আছে। সে লড়ছে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতার সঙ্গে। মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়ছে। উত্তর ২৪-পরগণার আমডাঙা তো বোমা তৈরির কেন্দ্রস্থলে পরিণত। রোজ পুলিশ লোক দেখানোর জন্য কিছু ওয়ান-শটার ও মুঙ্গেরী আগ্নেয়াস্ত্র ধরছে, কিন্তু যা ধরছে তার দশগুণ অপরাধীদের হাতে থেকে যাচ্ছে।

মমতা ব্যানার্জীর হিজাবপরা, ইমামদের ভাতা দেওয়া, মুসলমানদের ওবিসি বলার ছলে সংরক্ষণ পাইয়ে দেওয়া (যা আমাদের সংবিধানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) আজকে মানুষের মুখে মুখে। মমতার হিসাব খুব সরল : এই তোয়াজ করে মুসলমানের ত্রিশ শতাংশ ভোট কোঁচড়ে ভরতে হবে, তার জন্য নির্লজতর বেহায়া সাম্প্রদায়িকতা করতেও মমতা পেছপা নয়। তারপর কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদি দশ শতাংশ হিন্দু ভোট বাগিয়ে নেওয়া যায় তবে মমতা তো অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবে। কিন্তু এখানে মমতার ভয় বিজেপিকে। বিজেপির নেতৃত্বে যদি এই ধরণের নির্লজ্জতার

বরফের অভাব বা বাজারীকরণের পরিকল্পনার অভাব, মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা। মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণ তথা ঋণের বিষয়টিও ভীষণভাবে অবহেলিত। শাসক দলের একটি বড় অংশ জলাভূমি ভরাট করে পরিবেশ বিপন্ন করছে, পাশাপাশি মাছ চাষে রাজ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।

ঠ) চা-বাগান পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক বিষয়। সংগঠিত ২৭৩টি চা বাগানের জনসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। ২ লক্ষ ৬২ হাজার শ্রমিক এই চা বাগান গুলির সাথে যুক্ত। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ চা বাগান এই রাজ্যে, যেখানে দেশের প্রায় ২৬ শতাংশ চা উৎপাদিত হয়। পাশাপাশি ছোট ছোট অসংগঠিত বহু চা বাগান এই এলাকায় গড়ে উঠছে। সংগঠিত চা বাগানগুলি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হবার ফলে, প্রতিমুহূর্তে এদের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ২০০২ সাল থেকে ১০০০ জনের বেশী শ্রমিক পরিবারের সদস্য সংগঠিত চা বাগানগুলিতে অনাহারে মারা গেছেন। সংগঠিত চা বাগানগুলির মূল সমস্যগুলি হল -

১) কম উৎপাদনশীলতা - চা উৎপাদন একটি শ্রমিক নির্ভর ব্যবস্থা। শ্রমিকের সুস্বাস্থ্য অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনিয়মিত তথা কম মজুরী, অস্বাস্থ্যকর ঘর, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গণবন্টন ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কারণে চা শ্রমিকদের মধ্যে অনাহার তথা পুষ্টির অভাব একটি সাধারণ সমস্যা, যা তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস করে, ফলে চা উৎপাদানশীলতা হ্রাস পায়।

২) চা শ্রমিকদের অধিকাংশই অদক্ষ। কোন প্রশিক্ষণ কখনো পাননি। আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের কর্মকুশলতা কম। জলপাইগুড়ির একজন চা শ্রমিক দৈনিক যেখানে মাত্র ২৪ কোজি চা পাতা তুলতে পারেন, সেখানে একই সময়ে কাজ করে কিনিয়া এবং জিম্বাবোয়ের একজন চা শ্রমিক যথাক্রমে ৪৫ কেজি ও ৬৮ কেজি চা পাতা তোলেন।

৩) সংগঠিত চা বাগানগুলির মালিকপক্ষ পুরানো চা গাছ তুলে ফেলে নতুন গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে অনীহা দেখাচ্ছেন, ফলে চা-উৎপাদনশীলতা মার খাচ্ছে।

৪) গ্রীন টি'র চহিদা উত্তোরত্তর বাড়তে থাকায় চিরচরিত কালো চায়ের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

৫) শ্রমিক অসন্তোষের কারণেও চা-উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

অন্যদিকে, অসংগঠিত চা বাগানগুলিতে গুণমান সঠিক থাকছে না। বাগান থেকে চা তোলার ১২ ঘন্টার ভিতর প্রক্রিয়াকরণ না হলে, পাতা নষ্ট হয়ে যায়। অসংগঠিত চা বাগানগুলি তাই সংগঠিত চা বাগানের প্ল্যান্টে চা-পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হয়, এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অভাবী বিক্রির শিকার হয়।

ড) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদা, হুগলী এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার প্রায় ২৩ লক্ষ পরিবার পাট চাষের সাথে যুক্ত। সারা দেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পাট পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে

গ) সেচ পরিকাঠামোর দুর্বলতার জন্য রাজ্যের এক বড় অংশ বন্যাপ্রবণ। সেচ পরিকল্পনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে। কম বৃষ্টি বা বেশী বৃষ্টি রাজ্যের এক বড় অংশের কৃষককে প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্থ করে, তা সত্ত্বেও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে এলাকাভিত্তিক কৃষি-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতি আছে।

ঘ) একইরকম ভাবে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে খরিফ তথা রবি মরসুমের দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন হচ্ছে, তা মাথায় রেখে এলাকাভিত্তিক কৃষি-পরিকল্পনা হচ্ছে না। ফলতঃ চিরাচরিত প্রক্রিয়ায় চাষ করতে গিয়ে চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

ঙ) অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক সার ব্যবহার জমির উর্বরতা তথা জমিতে (খনিজ লবণকে) অনু-খাদ্য তথা উপকারি ব্যাক্টেরিয়া'র মাত্রায় হ্রাস ঘটিয়েছে। চাষ করতে গেলে আরো বেশী সার ও খনিজ লবণ প্রয়োজন হচ্ছে, যার ফলে চাষের খরচ বাড়ছে, কিন্তু উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ছে না। মাটি পরীক্ষা করে চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি এখনে অবহেলিত।

চ) ফসল মজুত রাখার ও প্রক্রিয়াকরণের পরিকাঠামোর অভাবে এক বিরাট অংশের ফুল, ফল, সব্জী নষ্ট হচ্ছে, অথবা চাষী অলাভজনক দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ছ) গবাদি প্রাণীপালক উৎপাদিত দুধের যে দাম পাচ্ছেন, তা খোলাবাজারে দুধের বিক্রয়মূল্যের প্রায় অর্ধেক। সঠিক দাম না পেয়ে প্রাণীপালক অনুৎসাহিত হয়ে গাভী পালন ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে বাজারে ভেজাল দুধের কারবার বেড়ে চলেছে, যা জনস্বাস্থের প্রশ্নে বিপদজনক।

জ) সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গরু চুরি, গবাদি প্রাণীপালনের অন্যতম বড় বাধা। বহু প্রাণীপালকের ফলে গাভী পালন ছেড়ে দিচ্ছেন। এই চুরিতে শাসক দলের নেতৃত্ব, শাসক দলের জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের অংশিদারিত্ব আছে, তাই চুরির অভিযোগগুলি থানা গ্রহণ করে না।

ঝ) প্রাণী খাদ্য উৎপাদনে সরকারি সহায়তার অভাবে, গবাদি প্রাণী খাদ্য'র দাম বেড়ে চলেছে পাশাপাশি গুণমানের ক্ষেত্রেও সমস্যা থাকছে। এর প্রভাবে খরচ বাড়লেও, দুধের পরিমাণ বা গুণমান অপরিবর্তীত থাকছে। সবুজ প্রাণীখাদ্য উৎপাদনের কোন সময়োপযোগী সহায়তা প্রাণীপালক পাচ্ছেন না। দুধ মজুত রাখার বাল্ক কুলার প্রক্রিয়াকরণের পরিকাঠামোর অভাবে, দুগ্ধজাত পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে।

ঞ) ডিম উৎপাদনে রাজ্যের ঘাটতি মেটানোর প্রশ্নে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় গলদ আছে। মুরগী, ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও বিষয়গুলি নিয়ে বাস্তবসম্মত বাজার অভিমুখী পরিকল্পনা নেই।

ট) রাজ্যের জলাশয়গুলি মাছ উৎপাদনে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে, মাছ উৎপাদনে রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত। উপযুক্ত গুণমানের মাছ-চারা উৎপাদনকেন্দ্রের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত গুণমানের যথেষ্ট জলাশয়ের অভাব, সাতে মাছ মজুত রাখার

ক) জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন, যার ফলে ৫০ এর দশক থেকে শিল্পে এই রাজ্য ছাড়তে শুরু করে।

খ) বাম, অতিবাম ও তৃণমূলের শিল্পবিরোধী আন্দোলন, যার ফলে এই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে অভূতপূর্ব অরাজকতা দেখা যায়, যা বহু নামী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে এই রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করে।

গ) ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লাভের জন্য রাজ্য সরকার শ্রমিক মালিক বিরোধ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে না, ফলে উৎপাদনে ব্যহত হয়, লাভ কমে যায়, শিল্প বন্ধ হয় এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় নতুন শিল্প রাজ্যে আসে না।

ঘ) শিল্পের জন্য জমির বন্দোবস্ত করারপ্রশ্নে রাজ্য সরকারের নেগেটিভ মনোভাব, সরকারি প্রকল্পগুলির ব্যয়ভার বাড়িয়ে তোলা, বেসরকারি প্রকল্পগুলিকে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করে।

ঙ) রাজ্যসরকার শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে বা শিল্পস্থাপনে ইনসেনটিভ প্রদানের প্রশ্নে উদাসীন। বিষয়গুলি শিল্পপতিদের অনুৎসাহিত করে।

চ) কিছু কিছু শিল্প আধুনিকিকরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আন্তরিক হলে, সেই শিল্পগুলি রুগ্ন হত না। কিন্তু চরম সরকারি ঔদাসিন্য ঐ শিল্পগুলি বন্ধ হতে বাধ্য করেছে।

ছ) শিল্পের অনুমতির জটিল প্রক্রিয়া। দপ্তগুলির আভ্যন্তরীন সামঞ্জস্য'র অভাব। ফলে প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমতি পেতে বহু সময় লেগে যায়।

জ) মেলা, উৎসবে অর্থ অপচয়ের ফলে, ঋণে জর্জরিত সরকার আয় বৃদ্ধির জন্য জমি বাড়ির স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি করে চলেছে, যা শিল্পপতিদের অনুৎসাহিত করছে।

ঝ) শিল্পের উপকরণ সহবরাহের জন্য শাসকদল দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে সিন্ডিকেট তৈরী করে সেখান থেকে শিল্পপতিদের বাধ্য করা হচ্ছে, বেশী দামে বাজে মানের সামগ্রী ক্রয় করতে। ফলতঃ শিল্পপতিরা উৎসাহ হারাচ্ছেন। নতুন বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে।

ঞ) শিল্পক্ষেত্রে শাসকদলের নেতা ও মস্তানদের তোলাবাজি, কাটমানি সংগ্রহ, শিল্পপতিদের মধ্যে ভীতর সঞ্চার করছে। রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। নতুন বিনিয়োগ আসছে না।

ট) পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। শাসকদলের নেতা ও মস্তানদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, কাটমান সংগ্রহ, হুমকি দেওয়া, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ করে না। আবার বিভিন্ন জিনিস রাজ্যের অভ্যন্তরে পরিবহনের ক্ষেত্রে গাড়ির চালকদের পুলিশি হায়রানি ও কাটমানির শিকারহতে হয়।

ঠ) একইভাবে ভূমি বা জমি-রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের কাজ দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতার অভাব তথা দীর্ঘসূত্রীতা শিল্পপতিদের অনুৎসাহিত করে। প্রসঙ্গতঃ পুলিশ তথা দুইটি দপ্তরই আবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আছে।

৬১টি চটকলে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন। ৭০ এর দশকের শেষ ভাগ থেকে তৎকালিন বাম সরকার চটকলের আধুনিকিকরণের বিষয়ে উদাসীন থাকায় সেই সময় থেকে পাটশিল্পের দুর্গতির গুরু।। প্লাস্টিক সহ সিন্থেটিক ফাইবারের ব্যবহারের ফলে চটের ব্যাগের ব্যবহার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে সস্তায় পাঠ এবং পাটজাত দ্রব্য আমদানীর ফলে পাটচাষী তথা শিল্প উভয়ই মার খেয়েছে।

২। শিল্পক্ষেত্রে ব্যর্থতা

১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন ছিল দেশের সর্বোচ্চ ১১.৬ শতাংশ যা বর্তমানে ৫.৮ শতাংশ এবং রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ। মাথাপিছু নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবে এই রাজ্যের স্থান ২৫ তম। একই সময়ে মোটকল কারখানার সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান থেকে নেমে এসেছে নবম স্থানে। শিল্পে কর্মসংস্থানের বিচারে তৎকালীন বোম্বে প্রদেশের পরেই দ্বিতীয় স্থানের গৌরবোজ্জ্বল স্থান থেকে নেমে এসে রাজ্য আজ দাঁড়িয়ে নবম স্থানে। ১৯৫১ সালে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হত এই রাজ্যে যা ২০১৬-১৭তে নেমে এসেছে ৫ শতাংশে তথা অষ্টম স্থানে।

শিল্পের অন্যতম প্রধান শর্ত হল বিদ্যুতের যোগান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় দাবী করেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য নাকি দারুন উন্নতি করেছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাথাপিছু বিদ্যুৎ যোগানের নিরীখে ২০১৭-১৮ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সমগ্র দেশের মধ্যে ২৯ তম (৫৫৪ কিলোওয়াট ঘন্টা)। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার নিরীখে এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৪তম (১০৫১৮ মেগাওয়াট)। বিদ্যুতের পাশাপাশি শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অপরটি হল সড়ক। রাজ্য সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩৬১২ কিমি, এবং এই প্রশ্নে স্থান সমগ্র দেশের মধ্যে ১৪ তম। ২০১৭-১৮ সালের হিসাবে মোট মূলধনী ব্যয়ের হিসাবে রাজ্য সপ্তম স্থানে আছে। ব্যবসার অনুকুল পরিবেশের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গ'র স্থান দশম। রপ্তানিতে, রাজ্যের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী রাজ্য নবম স্থানে। অর্থাৎ যে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতার সময় ছিল দেশের সবচাইতে শিল্পোন্নত রাজ্য, কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল শাসনের ৭২ বছরের পাপের ফলে, তা আজ বহু পিছনের সারিতে। বহুচর্চিত বর্তমান রাজ্য সরকারের গ্লোবাল বিজনেস সামিটের প্রেস রিলিজে বহু বিষয়ে আলোকপাত হলেও, বহু প্রতিশ্রুতি থাকলেও, ২০১১ পরবর্তী সময়ে নাম ধরে কোন কোন শিল্পে এসেছে তার কোন উল্লেখ থাকে না। কারন, শিল্পে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণগুলি অন্তঃসারশুন্য অথবা মিথ্যা। অথচ শিল্প না হলে কর্মসংস্থান হবে না, ভোগ্য তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা বাড়বে না, রাজ্যের নিজস্ব বাজার শক্তিশালী হবে না। ফলস্বরূপ অপরাধমূলক কাজ বাড়তেই থাকবে। সমাজ প্রতিনিয়ত বসবাসের অযোগ্য হতে থাকবে। তাই আশু প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রে অধোগতির মূল কারনগুলি হল -

চ) শিশুদের টিকাকরণের বিষয়টি এই রাজ্যে অবহেলিত। এই প্রশ্নে রাজ্যের স্থান ৩৩ তম।

ছ) যক্ষা রোগীর সংখ্যার বিচারে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতি ১ লক্ষ মানুষের ১০০ জনই এই মারন রোগে আক্রান্ত। এই প্রশ্নে রাজ্যের স্থান ২১টি বড় রাজ্যের ভিতর ১৮ তম।

জ) রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেহাল দশার মূল কারণ, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৪১ শতাংশ পদে চিকিৎসক না থাকা। এই বিচারে দেশের মধ্যে রাজ্য ১৭ তম স্থানে আছে।

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থতা

স্বাস্থ্যের মতই শিক্ষাক্ষেত্রে ঢক্কানিনাদ অনেক হলেও এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে রাজ্য। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলি হল ঃ-

ক) তোষনের ক্ষেত্রে হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে শিক্ষাঙ্গনকে। রামধনু হয়েছে রঙধনু। মাদ্রাসায় খুল্লমখুল্লা চলছে জঙ্গিশিক্ষা। অস্ত্রশিক্ষা। আল-আমিন-মিশনের ছাত্ররা হঠাৎ করে কারিগরি শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যপক সংখ্যায় সাফল্য পাচ্ছে।

খ) পাশাপাশি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাগুলি হয় উঠেছে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের কটমানি রোজগারের প্রধান জায়গা। ঘটি বাটি বেচে গরীব বাড়ির ছেলে মেয়েরা এই চাকরির আশায় লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি হিসাবে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

গ) শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল কোথাও প্রকাশ হচ্ছে না। সফলদের মোবাইলে মেসেজ যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, যারা পরীক্ষাতেই বসে নি তাদেরও কেউ কেউ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাটি আজ রাজ্যে কলুষিত।

ঘ) পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতি শিক্ষার মানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষমন্ত্রী উদাসীন। প্রাথমিকে ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাতের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৩৬টি রাজ্যের মধ্যে ৩১, উচ্চ-প্রাথকি ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাতের নিরীখে এই স্তান ৩৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রশ্নে এই স্থান ৩২, উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের স্থান ৩৩।

ঙ) নতুন কলেজ খোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বড় বড় ভাষণ দিলেও প্রতি ১ লক্ষ ১৮-২৩ বছরে বয়সী যুবক যুবতীদের জন্য যেখানে দেশে গড়ে ২৮টি কলেজ আছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা মাত্রই ১১। এই প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের স্তান ৩৬টি রাজ্যের মধ্যে ৩১।

৬। দুর্নীতি

ক) চিটফান্ড - গত ৮ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সীমাহীন দুর্নীতির সাক্ষী থেকেছে। সারদা, রোজভ্যালী সহ বিভিন্ন চিটফান্ডে টাকা রেখে সর্বসান্ত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ গরীব, মধ্যবিত্ত। এই সংক্রান্ত দুর্নীতির পরিমান ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশী। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই সমস্ত চিটফান্ড সংস্থার মালিকদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি, তার পরিবারের লোকজন,

ড) দক্ষ, আংশিক দক্ষ মানবসম্পদ, শিল্পস্থাপনের অন্যতম প্রদান শর্ত। পশ্চিমবঙ্গ এই প্রশ্নে বিরাট পিছিয়ে আছে। এখানকার বিপুল সংখ্যক বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ফি আদায় করলেও, তাদের শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পূন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে চরম ঔদাসিন্য দেখাচ্ছেন। রাজ্য সরকার এ প্রশ্নে নির্বাক দর্শক। পাশাপাশি পলিটেকনিক ও আইটিআই কলেজগুলির মাধ্যমেও, সঠিক সরকারি নীতির অভাবে শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠছে না।

৩। স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় আজিবিকা মিশনের অন্তর্গত ৭ লক্ষ ৬১ হাজার মহিলা স্বানির্ভর গোষ্ঠী আছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৭৭ লক্ষের বেশী। অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবারের মহিলা সদস্য এই কর্মসূচীর সাথে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছে এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ স্বল্প সুদে ঋণপ্রাপ্তি। কিন্তু কর্মসূচীটির মূল উদ্দেশ্য মহিলাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত করে তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র মুক্তির পথ প্রশস্ত করা। এর জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, এবং বাজারিকরনের প্রশ্নে পেশাদারি সহায়তা। এই বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গে সরকার উপেক্ষা করছেন। ফলতঃ গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারছে না।

৪। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যর্থতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যের উন্নতি বলতে হয়েছে কিছু নীল সাদা বাড়ি, যাতে না আছেন চিকিৎসিক, না আছে পরিকাঠামো। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেহাল অবস্থার কয়েকটি চিহ্ন নিম্নরূপঃ-

ক) স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সার্বিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, ২১ টি বড় রাজ্যের যে র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৬ তম।

খ) নবজাতক অপুষ্ট শিশুর অনুপাতের ভিত্তিতে দেশের ২১টি বড় রাজ্যের ভিতর এই রাজ্যের স্থান ২০ তম। রাজ্যের ১৬.৪ শতাংশ নবজাতকই অপুষ্ট। বিষয়টি রাজ্যের ভয়াবহ দারিদ্র পরিস্থিতি নির্দেশ করে।

গ) স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমস্ত গর্ভবতী মায়ের যাতে প্রসব হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কেন্দ্রীয় অনুদান থাকলেও, এই প্রশ্নেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে, দেশের ১৪তম স্থানে। অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব হলে মা ও সন্তান উভয়ই সুস্থ থাকবে।

ঘ) জন্ম হবার ২৮ দিনের ভিতর শিশু মৃত্যুর নিরীখে এই রাজ্যের স্থান ১৩তম। প্রতি ১ হাজার নবজাতকের মধ্যে ১৩ জনই জন্ম হবার ২৮ দিনের ভিতর মারা যায়।

ঙ) জন্মের প্রথম ৫ বছরের ভিতর শিশু মৃত্যুর নিরীখে এই রাজ্যের স্তান ৩০ তম। প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে ৩০ জনই জন্ম হবার ৫ বছরের ভিতর মারা যায়।

৮) লাগামছাড়া ঋণ

সরকারি খরচে অপ্রয়োজনীয় কাজ করার নেশায় তৃণমূল সরকার ব্যাপক পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করেছে। ২০১০-১১ সালে রাজ্যে মোট ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে সেই ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ বিগত ৮ বছরে রাজ্যের ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মাথায় চেপে আছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা দেনা। এই ঋণের জন্য প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা শোধ করতে হয় প্রতি বছর। এই টাকায় বহু উন্নয়ণের কাজ হতে পারত, কিন্তু এই সরকারের অদূরদর্শিতার জন্য তা সম্ভব হয় নি।

৯। অপরাধ

বেশীরভাগ অপারাধী তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, তৃণমূল শাসনে সরকার-প্রশাসন-অবরাধী মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তার ছাপ পড়েছে রাজ্যে ঘটা অপরাধের সংখ্যায়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে সারা দেশের অ্যাসিড হানার ঘটনার ২৬ শতাংশ ঘটেছে এই রাজ্যে, মানব পাচারের ৪৪ শতাংশ ঘটনার ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, দেশের সমস্ত অপরাধের ১৭ শতাংশ ঘটেছে এই রাজ্যে। এই সময়ে মহিলাদের সাথে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ৩২৫১৩টি, যা দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, এবং এই সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী চিহ্নিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই রাজ্য সর্বশেষ স্থান আছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের ক্ষেত্রে সারা দেশে যেখানে ১৯ শতাংশ ক্ষেত্রে অপরাধী চিহ্নিত হয়ে সাজা পায়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার মাত্র ৩ শতংশ।

১০। পরিবেশ হত্যা

তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের অপরিসীম লোভের ফলে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন। নদীর বালি, কয়লা খাদন, পাথর খাদান, মোরাম খাদান, গাছ, জলাভূমি সব লুঠ করার এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় মত্ত তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলির বাতাস ভয়ানক দূষিত। শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় ভূগছেন সমস্ত বয়সের মানুষ। সরকার চুপ। রাজ্যের শাসকদলের তেনা-মন্ত্রীরা কাটমানি খেয়ে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে দূষণের রিপোর্ট চেপে দিচ্ছে। মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এ নিয়ে ভৎর্সনাও করেছে রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের। একইভাবে, রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের কাটমান দিয়ে জলাভূমি অবৈধভাবে বুজিয়ে আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য বিপজ্জনকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। দামোদর থেকে তোর্সা, অবৈধভাবে নদীর বালি তোলায়, নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে। অল্প বৃষ্টিতেই প্লাবিত হচ্ছে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা। এই এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কৃষি সব হয়ে উঠছে বিপন্ন। জঙ্গল কেটে সাফ করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। গাছ কমে যাওয়ায় রাজ্যে গরমের তীব্রতা বাড়ছে, কমছে বৃষ্টি। স্বাস্থ্য বিপন্ন হচ্ছে, কৃষি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ নিয়েও মহামান্য সুপ্রীমকোর্টকে নজরদারি চালাতে

তার দলের বড় নেতারা এই দুর্নীতির মদতদাতা। তাই দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসার সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত সাক্ষ্য - প্রমাণ লোপাটের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সব পুলিশ অফিসার যারা মুক্যমন্ত্রীকে এই কাজে সাহায্য করেছে, তাদের অ্যারেষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় পর্যন্ত বসেছেন।

খ) নারদা ভিডিও - ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বচানের ঠিক আগে প্রকাশিত নারদা ভিডিওয় দেখা গেল তৃণমূলের বষীয়ান নেতা মন্ত্রীরা হাত পেতে টাকা নিচ্ছেন। পরে প্রমাণিত হল ভিডিওটি সঠিক। এতদসত্ত্বেও অভিযুক্তদের কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো হলই না, বরঞ্চ কারো কারো পদন্নতি হল।

গ) গ্রামাঞ্চলের মানুষ তৃণমূলের কাটমানির আক্রমনে জর্জরিত। নিজেদের ন্যায্য সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদের তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের প্রচুর কাটমানি দিতে হয়েছে এ যাবৎ। শারিরীক, প্রতিবন্ধী, অশক্ত বৃদ্ধ, বিধবা, কেউ কাটমানির আক্রমন থেকে রেহাই পান নি। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশনে শৌচাগার নির্মাণ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, আই সি ডি এসে খাবার সরবরাহ, কেন্দ্রীয় ফিনান্স কমিশন, রেশন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রকল্পগুলি থেকে গ্রামের দরিদ্র মানুষের প্রাপ্য টাকার বড় অংশ লুঠ করেছ তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। একইভাবে শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেছে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা।

৭। গণতন্ত্র হত্যা

ক) পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সংকট বিষয়ে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করেছেন মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত। এই রাজ্যে এই সময়ে চাষী সারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলে অ্যারেষ্ট হয়েছেন, অধ্যাপক অ্যারেষ্ট হয়েছে কার্টুন এঁকে, সিনেমায় রাজ্য সরকারের তীর্যক সমালোচনা থাকায় পুলিশ দিয়ে সিনোমার শো বন্ধ করা হয়েছে-সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপে সেই সিনেমা ফের চালু হয়েছে রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ের ব্যাগ পরীক্ষা করার অপরাধে কাষ্টমসের অফিসারেদের পুলিশ দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে, আর্থিক দুর্নীতির তদন্তকারী সিবিআই অফিসারদের কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য পুলিশ দিয়ে তাদের অ্যারেষ্ট করানো হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সঠিকভাবে নির্বাচন পরিচালনা করানোর অপরাধে রাজকুমার রায়কে সেই রাতেই অপহরণ করে খুন করা হলেও আজও তার তদন্ত হয় নি, দাড়িভিটে শিক্ষক সমস্যা নিয়ে শান্তিপূর্ণবাবে আন্দোলনরত ছাত্রদের পুলিশ দ্বারা গুলি করে খুন করা হয়।

খ) ২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চয়েত নির্বাচনে ২০১৫৯টি আসনে, বিরোধী দলগুলিকে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দীতার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই ৩৪ শতাংশের বেশী আসন বাদ দিয়েও যে কয়টিতে প্রার্থীছিল সেখানে ব্যাপক হারে ভোট লুঠ করা হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ গণতন্ত্রের এই হত্যালীলা নির্বাক হয়ে দেখে। একইভাবে এই সময়ে বল প্রয়োগ করে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে, পৌরসভাগুলিও দখল করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা আছে, সেই সব পুরসবা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও সেখানে নির্বাচন না করে প্রশাসক বসানো হয়েছে।

হচ্ছে। রাজ্যে অবৈধ নির্মাণের বাড়বাড়ন্ত হওয়া এবং ইচ্ছে মত ভূ-গর্ভস্থ জল তোলার ফলে, বহু শহরের জলস্তর বিপজ্জনভাবে হ্রাস পেয়েছে। তৃমমূলের নেতা-মন্ত্রীদের লোভ এক ভয়ংকর জল সঙ্কটের দিকে রাজ্যকে ঠেলছে। সাথে বহু জেলার বহু মানুষ আজ আর্সেনিকের প্রভাবে অসুস্থ। তৃণমূলের প্রভাবে রাজ্যের জল, জঙ্গল, বাতাস সব ক্ষতিগ্রস্থ বা বিষাক্ত।

পশ্চিমবঙ্গবাসী আর কতদিন এই জিনিস সহ্য করবেন। এর থেকে পরিত্রাণ করতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি।

ভারতমাতা কী জয়